ফেলুদা সমগ্র

গ্যাংটকে গণ্ডগোল

সত্যজিৎ রায়

সূচিপত্র

১. গ্যাংটকে গণ্ডগোল 2
২. আমাদের হোটেলের নাম স্নো- ভিউ 11
৩. কুয়াশা কাটলে কী হবে 25
৪. ভোরে বৃষ্টি থেমেছে 38
৫. খুনের জায়গা 47
৬. রুমটেক যেতে হলে 54
৭. বঙ্গালি মনে হতেছে 64
৮. আমাদের হোটেলের রান্না 73
৯. আসলে ফেলুদা বাথরুমে যায়নি 79
১০. ঘরে এসে ঢোকার পর 88
১১. গ্যাংটক থেকে পেমিয়াংচি 96
১২. শশধর বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন 103

১. গ্যাংটকে গণ্ডগোল

কিছুক্ষণ আগে অবধি জানালা দিয়ে বাইরে নীচের দিকে তাকালেই শুকনো হলদে মাটি আর সরু সরু সিস্কের সুতোর মতো এঁকে-বেঁকে যাওয়া নদী আর মাঝে মাঝে খুদে-খুদে গ্রামের খুন্দ-খুদে ঘর বাড়ি গাছপালা দেখতে পাচ্ছিলাম। হঠাৎ কোত্থেকে জানি মেঘ এসে পড়াতে সে-সব আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে এখন প্লেনের যাত্রীদের দিকে দেখছি।

আমার পাশেই বসেছে ফেলুদা, তার হাতে একটা মহাকাশ ভ্রমণ সম্বন্ধে বই। ফেলুদা অনেক বই পড়ে, তবে আজ পর্যন্ত কখনও ওকে একই বিষয় নিয়ে পর পর দুটো বই পড়তে দেখিনি। কালই রাত্রে কলকাতায় দেখেছি, ও তাকলামাকান মরুভূমির উপর একটা বই পড়ছে। তার আগে ও দুটো বই একসঙ্গে পড়ছিল—সকলে একটা, রাত্রে একটা। একটা গল্পের বই, অন্যটা পৃথিবীর নানান দেশের রান্না সম্পর্কে! ও বলে, একজন গোয়েন্দার পক্ষে জেনারেল নলেজ জিনিসটা ভীষণ দরকারি; কখন যে কোন জ্ঞানটা কাজে লেগে যায়, তা বলা যায় না।

আমাদের লাইনে প্যাসেজের উলটোদিকে পাশাপাশি দুটো সিটে দুজন ভদ্রলোক বসে আছেন। যিনি দূরে বসে, তাঁর শুধু ডান হাতটা আর নীল প্যান্টের খানিকটা অংশ দেখতে পাচ্ছি। হাতের আঙুল দিয়ে তিনি হাঁটুর উপর তাল ঠুকছেন। বোধহয় আপন মনে গান গাইছেন। যিনি কাছে বসে আছেন, তিনি বেশ আঁটিসাঁট চকচকে ভদ্রলোক। হাতের কবজিটা দেখে বেশ জোয়ান মনে হলেও, জুলপির কাছে পাকা চুল থাকতে মনে হয় ভদ্রলোকের বয়স অন্তত পঁয়তাল্লিশ তো হবেই। একটা স্টেটসম্যান খুলে ভারী মনোযোগ দিয়ে কী জানি পড়ছেন তিনি! ফেলুদা হলে শুধু চেহারা দেখেই লোকটা সম্বন্ধে অনেক কিছু বলে দিতে পারত। আমি সময় কাটানোর জন্য অনেকক্ষণ একদৃষ্টি চেয়ে থেকেও কিছুই বার করতে পারলাম না।

'ও রকম হাঁ করে কী দেখছিস?'

চাপা গলায় ফেলুদার হঠাৎ-প্রশ্নটা চমকে দিয়েছিল। কথাটা বলে ও একবার আড়চোখে ভদ্রলোকের দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'যে রেটে খায় লোকটা, সে তুলনায় শরীরে তেমন চর্বি জমেনি এখনও।'

এটা বলতে মনে পড়ল সত্যিই ভদ্রলোক এই এক ঘণ্টার মধ্যেই দুবার চেয়ে চা খেয়েছেন, আর তার সঙ্গে গোটা তিনেক করে বিস্কুটও। বললাম, 'আর কী বুঝলে?

'ভদ্রলোকের প্লেনে চড়া অভ্যোস আছে। '

'কী করে জানলে?'

'একটু আগেই প্লেনটা একটা এয়ার পকেটে পড়ে ধড়াস্ করে বাম্প করেছিল—মনে আছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ-ওরে বাবা—আমার তো পেটের ভিতরটা কী রকম করে উঠেছিল।'

'শুধু তুই কেন, আশেপাশের সকলেই নড়েচড়ে উঠেছিল, একমাত্র উনিই দেখলাম কাগজ থেকে চোখটি পর্যন্ত তুললেন না।'

'আর কী বুঝলে?'

'লোকটার মাথার সামনের দিকের চুল বেশ পরিপটি রয়েছে, কিন্তু পেছনটা এলোমেলো হয়ে মোরগের ঝুটি হয়ে গেছে।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি।'

'অথচ প্লেনে লোকটা সিটে মাথা ঠেকিয়ে শোয়নি একবারও, একটানা সোজা হয়ে বসে কাগজ পড়েছে, আর না হয় চা-বিস্কুট খেয়েছে। তার মানে দমদমে ওয়েটিং রুমে—'

'বুঝেছি, বুঝেছি।–তার মানে ও প্লেন ছাড়ার বেশ কিছুক্ষণ আগেই দমদম পৌঁছেছিল, আর তাই–'

'ভেরি গুড। হাতে সময় আছে দেখে সোফায় বসে পা ছড়িয়ে মাথা চিতিয়ে বিশ্রাম করে নিয়েছে। তাই পিছনের চুলের ওই দশা।'

ফেলুদার এই ক্ষমতাটা সত্যিই অবাক করে দেবার মতো। আরও আশ্চর্য এই যে, এগুলো বুঝে ফেলার জন্য ওকে আমার মতো ড্যাব-ড্যাব করে চেয়ে থাকতে হয় না অচেনা লোকের দিকে। দু-একবার আড়চোখে দেখে নিলেই কাজ হয়ে যায়।

'লোকটা কোন দেশি বলা তো।' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

এটার জবাব দেওয়া ভারী কঠিন। বললাম, 'লোকটা পরে আছে সুট, হাতে আবার ইংরেজি কাগজ-কী করে বুঝব? বাঙালি, মারাঠি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি–এনিথিং হতে পারে।'

ফেলুদা ছিক্ করে জিভ দিয়ে একটা শব্দ করে মাথা নেড়ে বলল, 'কবে যে অবজারভেশন শিখবি তা জানি না। লোকটার ডান হাতে কী রয়েছে?'

'খবরের–না না, একটা আংটি!'

'আংটিতে কী আছে?'

চোখ কুঁচকে ভাল করে চেয়ে দেখলাম সোনার আংটির মাঝখানে লেখা রয়েছে 'মা' । ক

অন্য যাত্রীদের সম্বন্ধেও প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়ে লাউডস্পিকারে বলে উঠল বাগডোগরা পৌঁছাতে আর বেশি সময় নেই–'প্লিজ ফাস্‌ন ইয়োর সিট বেল্টস অ্যান্ড অবজার্ভ দ্য নো-স্মোকিং সাইন।'

বাগডোগরা বলতে অনেকেই মনে করবে, আমরা হয়তো দার্জিলিং কিম্বা কালিম্পং যাচ্ছি। আসলে তা নয়। আমরা যাচ্ছি সিকিমের রাজধানী গ্যাংটকে। এর আগে গ্রীষ্মের ছুটিতে দুবার দার্জিলিং গেছি; এবারও প্রথমে দার্জিলিং-এর কথাই হয়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ফেলুদা গ্যাংটকের নাম করল। বাবার হঠাৎ ব্যাঙ্গালোরে একটা কাজ পড়ে গেল বলে উনি আর এলেন না। বললেন, 'তুই পরীক্ষা দিয়ে বসে আছিস, ফেলুরও ছুটি পাওনা হয়েছে-দিন পনেরোর জন্য ঘুরে আয়। কলকাতায় বসে ভ্যাপসা গরমে পচার কোনও মানে হয় না।'

ফেলুদা গ্যাংটক বলল তার কারণ বোধহয় এই যে, ইদানীং ও তিব্বত নিয়ে পড়াশুনা করেছে। (সেই ফাঁকে আমিও একটা স্বেন হেদিনের লেখা ভ্রমণ কাহিনী পড়ে ফেলেছি)। সিকিমে তিব্বতের অনেক কিছুই এসে জমা হয়েছে। সিকিমের রাজা তিব্বতি, সিকিমের গুম্ফাগুলোতে তিব্বতি লামাদের দেখা যায়, সিকিমের অনেক গ্রামে তিব্বতি রেফিউজিরা এসে রয়েছে। তিব্বতের গান, তিব্বতের খাবার, তিব্বতের পোশাক, তিব্বতের মুখোশ-পরা নাচ-এ সবই নাকি সিকিমে রয়েছে। আমিও তাই আর গ্যাংটক নিয়ে আপত্তি করিনি। সত্যি বলতে কী, আমার এই খুড়তুতো দাদাটির সঙ্গে যদি উলুবেড়েতেও ছুটি কাটাতে হয়, তাতেও আমি রাজি। অবিশ্যি তার সঙ্গে যদি সে-জায়গায় কোনও রহস্যের সন্ধান মেলে, তা হলে তো পোয়াবারো। গোয়েন্দাগিরিতে ফেলুদার জুড়ি আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই।

বাগডোগরা এয়ারপোর্টে এসে প্লেন নামলি ঠিক সাড়ে সাতটায়। কলকাতা থেকেই বাবা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যাতে আমাদের জন্য এখানে একটা জিপ মজুত থাকে। আমরা সটান জিপে না উঠে আগে এয়ারপোর্টের রেস্টোরান্টে গিয়ে বেশ ভাল করে ব্রেকফাস্ট করে নিলাম; কারণ এখান থেকে গ্যাংটক যেতে লাগবে প্রায় ছ-সাত ঘণ্টা। রাস্তা খারাপ থাকলে আরও বেশি লাগতে পারে। তবে ভরসা এই যে আজি সবে চোদ্দই এপ্রিল; মনে হয় এখনও তেমন বর্ষা নামেনি।

অমলেটটা শেষ করে মাছ ভাজা ধরেছি, এমন সময় দেখি প্লেনের সেই ভদ্রলোকটি একটা কোনার টেবিল থেকে উঠে রুমালে মুখ মুছতে মুছতে আমাদেরই দিকে হাসিমুখে এগিয়ে আসছেন।

'আপনারা কি ড্যাং, না ক্যাং, না গ্যাং?

আমি তো প্রশ্ন শুনে ঘাবড়েই গেলাম। এ আবার কী হেঁয়ালিতে কথা বলছেন। ভদ্রলোক? কিন্তু ফেলুদা তৎক্ষণাৎ হেসে উত্তর দিল 'গ্যাং।'

গ্যাং শুনে ভদ্রলোক বললেন, 'জিপের ব্যবস্থা আছে? মানে, সোজা কথা–আপনাদের সঙ্গে শেয়ারে লটকে পড়তে পারি কি?'

ফেলুদা বলল, 'স্বচ্ছন্দে, আর আমিও বুঝে ফেললাম যে ড্যাং হচ্ছে দার্জিলিং, ক্যাং কালিম্পং আর গ্যাং গ্যাংটক।

ভদ্রলোক বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ। আমার নাম শশধর বোস।'

'কী ব্যাপার?' ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন। 'হলিডে?'

'তা ছাড়া আর কী!'

'আই লাভ গ্যাংটক। আগে গেছেন কখনও?

'আজ্ঞে না।'

'কোথায় উঠছেন?'

ফেলুদা বেয়ারাকে ডেকে বিল আনার কথা বলে দিয়ে ভদ্রলোককে একটি চারমিনার অফার করে নিজে একটা ধরিয়ে বলল, 'একটা হোটেলে ঘর বুক করা আছে। নাম বোধ হয় স্নো-ভিউ।'

শশধরবাবু বললেন, 'গ্যাংটকের নাড়ি-নক্ষত্র আমার জানা। শুধু গ্যাংটক কেন—সারা সিকিম চষে বেড়িয়েছি। লাচেন, লচুং, নামচে, নাথুলা—কিছুই বাদ নেই। গ্লোরিয়াস! যেমন দৃশ্য, তেমনি শান্তি। পাহাড় চান পাহাড়, অর্কিড চান অর্কিড-রোদ চান, মেঘ চান, বৃষ্টি চান, মিষ্ট চান—সব পাবেন। তিস্তা, রঙ্গিত—নদীগুলোর কোনও তুলনা নেই। তবে গণ্ডগোল হল রাস্তা নিয়ে—রোডস্—বুঝেছেন। আসলে এ দিকের পাহাড়গুলো, যাকে বলে গ্রোইং মাউনটেনস। এখনও বাড়ছে। তাই একটু অস্থির, বুঝেছেন—আর কাঁচা। ইয়াং বয়সে যা হয়। আর কী-হে হে!'

'তার ফলেই বুঝি ল্যান্ডস্লাইড হয়?'

'ইয়েস, আর সে বড় বেয়াড়া ব্যাপার। যাচ্ছেন যাচ্ছেন, হঠাৎ দেখলেন সামনে রাস্তা বন্ধ-ধ্বসে গেছে। তার মানে ব্লাস্টিং, পাথর ভাঙো, দেয়াল তোলো, মাটি ফেলো-সে অনেক ঝক্কি। তাও আমি আছে বলে রক্ষে, চটপট সরিয়ে নেয়। তবে এখনও বৃষ্টিটা তেমন নামেনি, তাই খুব একটা গোলমাল হবে বলে মনে হয় না। যাক-আপনাদের পেয়ে খুব আনন্দ হল, সুবিধেও হল। এক এক এতখানি পথ যেতে হবে ভাবতে বিশ্রী লাগছিল। কম্পানি পেলে গপ্পেটপ্পে করে সময়টা কেটে যায়।'

ফেলুদা বলল, 'আপনিও কি চেঞ্জে যাচ্ছেন?'

'আরো না মশাই!' ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। 'আমি যাচ্ছি। কাজে। তবে সে এক পিকিউলিয়ার কাজ। অ্যারোম্যাটিক প্লান্টস জানেন?'

'আপনার বুঝি পারফিউমারির ব্যবসা?'

'ঠিক ধরেছেন। কেমিক্যাল ফার্ম। তার অনেক কাজের একটা হচ্ছে এসেন্স তৈরি করা। সিকিমে কিছু আমাদের প্রয়োজনীয় গাছ আছে সেটা জানি। সেগুলো সংগ্রহ করতেই যাওয়া। আমার পার্টনার আগেই গেছে-দিন সাতেক হল। গাছপালা সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান-

বটানিতে ডিগ্রি আছে। আমারও ওর সঙ্গে যাবার কথা ছিল–শেষটায় এক ভাগনের বিয়ের ব্যাপারে ঘাটশিলা চলে যেতে হল। কাল রাত্রেই কলকাতা ফিরেছি।’

বিল দেওয়া হয়ে গিয়েছিল, তাই আমরা উঠে পড়লাম। মালপত্র তুলে নিয়ে জিপের দিকে যেতে যেতে ফেলুদা বলল, ‘আপনাদের কোম্পানিটা কোথায়?’

শশধরবাবু বললেন, ‘বম্বে। কোম্পানি প্রায় বিশ বছর হতে চলল। আমি জয়েন করেছি বছর সাতেক। এস্ এস্ কেমিক্যালস। শিবকুমার শেলভাঙ্কার-ওর নামেই নাম।’

বাগডোগরা থেকে শিলিগুড়ি হয়ে সেবক রোড। সেবক রোড থেকে ডান দিকে তিস্তা নদীকে রেখে রাস্তা চড়াই উঠতে আরম্ভ করে। তারপর মাঝে মাঝে নীচেও নামে, দার্জিলিং-এর মতো সমানে চড়াই ওঠে না। রংপো-তে গিয়ে পশ্চিমবাংলার শেষ আর সিকিমের শুরু।

তিস্তার ধারেই তিস্তা বাজার বলে একটা জায়গা আছে, যেখানে একটা প্রকাণ্ড ব্রিজের উপর দিয়ে নদী পেরিয়ে উলটোদিকের পাহাড়ের রাস্তা ধরতে হয়। তিস্তা বাজারে আমাদের জিপ থামানো হল। রোদ থাকার ফলে বেশ গরম লাগছিল, তাই শশধর বাবু বললেন, ‘কোকা-কোলা খাবেন? এ জায়গাটা নাকি দুবছর আগে তিস্তার বন্যায় একেবারে ভেসে গিয়েছিল। দোকানপাট ঘরবাড়ি যা দেখছি, সবই নাকি নতুন তৈরি হয়েছে। দেখেও তাই মনে হয়। ব্রিজটাও নতুন; আগেরটা জলের তোড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল।

শশধরবাবু দেখলাম পর পর দু বোতল কোকা-কোলা সাবাড়ি করে দিলেন। সেই সঙ্গে অবিশ্যি আমাদেরও খাওয়ালেন। মনে মনে ভাবলাম–গ্যাংটকে আশা করি কোল্ড ড্রিঙ্ক খেয়ে শরীর ঠাণ্ডা রাখতে হবে না। পাঁচ হাজার ফুট হাইট যখন, নিশ্চয়ই এখানের চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা হবে।

'কোক' খাওয়া সেরে যখন দোকানে বোতলগুলো ফেরত দিচ্ছি, তখন লক্ষ করলাম কিছু দূরেই একটা জিপের পাশে দাঁড়িয়ে কয়েকজন লোক (তার মধ্যে দুজন মিলিটারিও আছে) হাতটাত নেড়ে বেশ উত্তেজিতভাবে কী জানি আলোচনা করছে। জিপটা উলটোদিক থেকে এসেছে—বোধ হয় শিলিগুড়িই যাবে। 'অ্যাক্সিডেন্ট' কথাটা হঠাৎ কানে আসাতে আমরা তিনজনেই জিপটার দিকে এগিয়ে গেলাম, আর গিয়ে যা শুনলাম, সে এক বিশ্রী ব্যাপার। ও দিকে বৃষ্টি না হলেও, গ্যাংটকে নাকি দিন-সাতেক আগে বেশ বৃষ্টি হয়েছে, আর তার ফলে পাহাড় থেকে একটা পাথর গড়িয়ে একটা জিপের উপর পড়ে একজন লোক নাকি মারা গেছে। জিপটাও নাকি রাস্তা থেকে গড়িয়ে প্রায় পাঁচশো ফুট নীচে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। যে মরেছে, তার নাম-ধাম এরা কেউ বলতে পারল না, কারণ এরা কেউ গ্যাংটক থেকে আসছে না।

ফেলুদা খবরটা শুনে বলল, 'একেই বলে নিয়তি। লোকটার নেহাতই মরণ ছিল, না হলে একটা চলন্ত গাড়ির উপর একটা মাত্র খসা পাথর এসে পড়া-এ ঘটনা সচরাচর ঘটে না।'

শশধরঝাবু বললেন, 'ওয়ান চান্স ইন এ মিলিয়ন।' তারপর জিপে উঠতে উঠতে বললেন, 'যাবার সময় দৃষ্টিটা পাহাড়ের গায়ে রাখবেন, আর কানটা খোলা রাখবেন। সাবধানের মার নেই মশাই।'

তিস্তা ছাড়বার কিছুক্ষণ পর থেকেই চারিদিকের দৃশ্য এমন অদ্ভুত সুন্দর হয়ে উঠতে লাগল যে, অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা মান থেকে মুছে গেল। রংপো পেরিয়ে কিছু দূর যাবার পর এক পশলা বৃষ্টি হওয়ায় গরমটা এমনিতেই কমে গিয়েছিল, তার উপরে তিন হাজার ফুট হাইটের মাথায় যখন কুয়াশা আরম্ভ হল, তখন রীতিমতো ঠাণ্ডা লাগতে লাগল। গ্যাংটক আসতে যখন দশ কিলোমিটার বাকি, তখন এক জায়গায় জিপ থামিয়ে সুটকেস খুলে কোট আর মাফলারটা বার করে পরে নিলাম। শশধরবাবুও দেখলাম এয়ার ইন্ডিয়ার একটা ব্যাগ খুলে একটা নীল পুলওভার বার করে সেটা তাঁর ঠাণ্ডা কেটের তলায় চাপিয়ে নিলেন।

ক্রমে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে আবছা আবছা চোখে পড়ল, পাহাড়ের গায়ে নীল রঙের চিনে প্যাটার্নের ছাতওয়ালা সব ঘরবাড়ি। শশধরবাবু বললেন, 'পাঁচ ঘণ্টাও লাগল না৷ উই আর ভেরি লাকি৷'

দোকান-বাড়ির সারি পেরিয়ে, লাল নীল সবুজ হলদে ডুরে কাটা পোশাকপরা কাঁধে বাচ্চা-নেওয়া মেয়ে, আর বাহারের টুপি আর রংবেরঙের জামা পরা সিকিমি নেপালি ভুটিয়া তিব্বতি পুরুষদের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের জিপ গিয়ে পৌঁছল স্নোভিউ হোটেলের সামনে। শশধরবাবু ডাকবাংলোয় যাবেন বলে আমাদের কাছ থেকে তখনকার মতো বিদায় নিলেন। যাবার সময় বললেন, 'এ সব জায়গায়, জানেন তো, চান কি না চান, চারবেলা অন্তত একবার করে দেখা না হয়ে যায় না।'

ফেলুদা বলল, 'আপাতত আপনি ছাড়া আর কাউকেই চিনি না। এখানে। বিকেলে একবার ডাকবাংলোর দিকটায় টু মেরে আসব।'

'বহুৎ আচ্ছা' বলে হাত নেড়ে জিপের সঙ্গে ভদ্রলোকও কুয়াশায় মিলিয়ে গেলেন।

২. আমাদের হোটেলের নাম স্নো-ভিউ

আমাদের হোটেলের নাম যদিও স্নো-ভিউ, আর যদিও সত্যি করেই নাকি পিছনের ঘরগুলোর জানালা দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়, এসে অবধি এখনও পর্যন্ত কুয়াশা কাটেনি বলে আমাদের স্নো-ভিউ করা হয়নি। হোটেলের মালিক একজন পাঞ্জাবি ভদ্রলোক-নাম মিস্টার বিবরা। আর যে- সব লোক হোটেলে রয়েছে, তার মধ্যে মনে হল মাত্র একজনই বাঙালি। এখনও আলাপ হয়নি। বাঙালি বুঝলাম, কারণ দুপুরে কাঁটা চামচ দিয়ে খাবার সময় তাঁর হাত থেকে কাঁটাটা ছিটকে মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট শুনলাম। তিনি বলে উঠলেন, ‘ধুত্তেরি।’

খাওয়া-দাওয়া সেরে হোটেলের সামনেই সারি সারি দোকানওয়ালা বড় রাস্তায় বেরিয়ে দু মিনিটের মধ্যেই ফেলুদা একটা পানের দোকান আবিষ্কার করে সেখান থেকে মিঠে পান কিনল। বলল, ‘এ জিনিসটা যে এখানে পাওয়া যাবে তা ভাবিনি।’ ও দুপুরে আর রাত্রে রোজ খাবার পরে একটা করে মিঠে পান খায়–তবে খায়ের ছাড়া, কারণ ঠোঁট লাল হওয়াটা ও একেবারেই পছন্দ করে না।

গ্যাংটকের এ রাস্তাটা দেখলাম। রীতিমতো চওড়া; রাস্তার মাঝখানে জিপ লরি স্টেশন ওয়াগন ইত্যাদি নানারকম গাড়ি লাইন বেঁধে পার্ক করা রয়েছে, আর রাস্তার দুদিকে দোকান৷ দোকানের নাম দেখে বোঝা যায়। ভারতবর্ষের অনেক জায়গার লোক সিকিমে এসে ব্যবসা গেড়ে বসেছে। পাঞ্জাবি, মাড়োয়ারি, গুজরাটি, সিন্ধি-সব রকম লোক সিকিমে এসে দাোকান করেছে। বাঙালি প্রায় চোখে পড়ে না বললেই চলে; কুয়াশার মধ্যে বেশি দূর অবধি দেখা না গেলেও একটা জিনিস বেশ বুঝতে পারছিলাম যে, দার্জিলিং-এর সঙ্গে এ জায়গাটার বেশ একটা তফাত রয়েছে। সবচেয়ে বড় তফাত এই যে, এখানে লোকজনের ভিড়টা কম, তাই গোলমালটা কম, আর তাই নোংরাটাও কম।

খাওয়া-দাওয়া হল, মিঠে পানিও হল, সবে ভাবছি। এবার জায়গাটা একটু ঘুরে দেখলে হয়, এমন সময় হঠাৎ দেখি কুয়াশার মধ্যে দিয়ে শশধর বাবুকে দেখা যাচ্ছে। তিনি যেন ব্যস্তভাবে এই হোটেলের দিকেই এগিয়ে আসছেন। ফেলুদাকে দেখতে পেয়েই ভদ্রলোক আরও জোরে পা ফেলে এগিয়ে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেছে!'

'কী ব্যাপার?'

'সকলে তিস্তায় যে অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা শুনলেন সেটা কার জানেন?'

প্রশ্নটা শুনেই আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ ধাক্কা দিয়ে উঠেছিল, ভদ্রলোকের কথায় সেটা সত্যি হয়ে গেল।

'এস এস। আমার পার্টনার।'

'বলেন কী? কোথায় যাচ্ছিলেন ভদ্রলোক?'

'মা গঙ্গাই জানেন। টেরিবল ব্যাপার!'

'তৎক্ষণাৎ মারা গেছেন?'

'ঘণ্টা চারেক বেঁচে ছিল। হাসপাতালে আনার আধা ঘণ্টার মধ্যেই মারা যায়। মাথায় চোট, হাড়গোড় ভেঙেছিল; মারা যাবার আগে নাকি একবার জ্ঞান হয়েছিল। আমার নাম করে।'বোস' 'বোস' করে দু-একবার বলে। তারপরই শেষ।'

'খবরটা পাওয়া যায় কী করে?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

আমারা হোটেলে গিয়ে ঢুকলাম। একতলার ডাইনিং রুম এখন খালি। তিনজনে তিনটে চেয়ার দখল করে বসলাম। শশধরবাবু একটা সবুজ রুমাল কোটের বুক-পকেট থেকে বার করে কপালের ঘাম মুছলেন।

'সেও এক ব্যাপার। ড্রাইভারটা মরেনি। পাথরটা গাড়িটায় এসে লেগেছে, আর ড্রাইভারও স্টিয়ারিং-এর কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলেছে। এমনিতে পাথরটা নাকি খুব একটা বড় কিছু ছিল না, কিন্তু স্টিয়ারিং ঘুরে যাওয়াতে গাড়ি রাস্তা থেকে সরে একেবারে কত হয়ে খাদে পড়েছে। ড্রাইভার ছিল খাদের উলটো দিকে-যেই না গাড়ি কাত হয়েছে, ব্যাটা লাফ দিয়ে একেবারে রাস্তায়। মাইনর ইনজুরি–বাঁ চোখের পাশটায় সামান্য একটু ছড়েছে–দ্যাট্স অল। জিপ, এদিকে শেলভাঙ্কার সমেত একেবারে পাঁচশো ফুট নীচে। নর্থ সিকিম হাইওয়েতে অ্যাক্সিডেন্ট। ড্রাইভারটা সেখান থেকে গ্যাংটকের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করেছে। খবরটা দেবে বলে। পথে কিছু নেপালি মজুরদের দেখে তাদের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে এস্ এস্-এর বডি উদ্ধার করে। তাঁরাই বয়ে আনছিল, এমন সময় একটা আর্মি জিপ এসে পড়ে। তারপর হাসপাতাল। তারপর...ওয়েল...'

যে লোকটাকে দু ঘণ্টা আগেও ফুর্তিবাজ বলে মনে হয়েছিল, তাকে এ রকম ভেঙে পড়তে দেখে অদ্ভুত লাগছিল।

'ডেডবডি কী হ'ল?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'বম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বম্বেতে ওর ভাইকে কনট্যাক্ট করেছিল–ব্যারিস্টার ভাই; এস এস-এর স্ত্রী নেই। দুবার বিয়ে করেছিল, দুই স্ত্রীই মারা গেছে। প্রথম পক্ষের একটি ছেলে ছিল–সে বছর-চোদ্দ আগে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। সে অনেক ব্যাপার। এস এস ছেলেকে ভীষণ ভালবাসত, তার অনেক খোঁজ করেছিল, কিন্তু তার আর কোনও পাত্তাই পাওয়া যায়নি। তাই ভাইকেই ইনফর্ম করেছিল। ভাই পোস্টমর্টেম করতে দেয়নি, তাই বডি তার পরদিন পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

এখানে বলে রাখি–পোস্টমর্টেম কথাটার মানে আমি ফেলুদার কাছেই জেনেছিলাম। কেউ যদি অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনকভাবে মারা যায়, তা হলে পুলিশের তদন্ত হয়, আর তখন পুলিশের ডাক্তার মৃতদেহ পরীক্ষা করে রিপোর্ট দেয়–কখন মরেছে, কোথায় চাট পেয়ে মরেছে, বিষ খাওয়ানো হয়েছিল কি না–এই সব আর কী? একেই বলে পোস্টমর্টেম।

ফেলুদা বলল, ‘কবে ঘটেছে ব্যাপারটা?’

শশধরবাবু বললেন, ‘ইলেভন্‌থ সকালে। সাতুই ও এখানে এসে পৌঁছেছিল।’ তারপর আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললেন, ‘আমি তো এখনও বিশ্বাসই করতে পারছি না!...কার কপালে যে কখন কী ঘটে! তবে আমি থাকলে বোধহয় এ দুর্ঘটনা ঘটত না।’

‘আপনার প্ল্যান কী?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘কী আবার? আর তো এখানে থাকার কোনও মানে হয় না। আমি এখন যাচ্ছি। কাল সকালে যদি একটা ফ্লাইট পাওয়া যায়। তার খোঁজ করতে। চেনাশোনা আছে, হয়ে যাবে বলে মনে হয়।’

শশধর বাবু উঠে পড়লেন।

‘চলি। যাবার আগে একবার দেখা হবে নিশ্চয়ই। আপনারা আর এ নিয়ে ভাববেন না। হ্যাভ এ গুড টাইম!’

ভদ্রলোক হোটেল থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন। ফেলুদা কিছুক্ষণ চুপ করে ভুরু কুঁচকিয়ে বসে থেকে সকালে অ্যাক্সিডেন্টের কথা শুনে শশধর বাবু যে কথাটা বলেছিলেন, সেটাই ফিস ফিস করে দুবার বলল-‘ওয়ান চান্স ইন মিলিয়ন।’ তারপর বলল, ‘অবিশ্যি মাথায় বাজ পড়েও তো লোক মারে। সেটাও কম আশ্চর্য নয়।’

আমি এতক্ষণ লক্ষ করিনি, এখন দেখলাম, আমাদের কাছেই আরেকটা চেয়ারে হোটেলের সেই বাঙালি ভদ্রলোকটি হাতে ‘আনন্দবাজার’ খুলে বসে আছেন। শশধরবাবু চলে যেতেই তিনি কাগজটা ভাঁজ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ফেলুদাকে নমস্কার করে তার পাশের চেয়ারে বসে বললেন, ‘সিকিমের রাস্তাঘাটে কখন যে কী হয় কিছুই বলা যায় না। এখানে পাথর পড়ে মানুষ মরাটা কিছুই আশ্চর্য না। আপনারা তো আজই এলেন?’

ফেলুদা একটা গভীর হুঁ-এর মতো শব্দ করল। ভদ্রলোক একটা স্টিলের ফ্রেমে হালকা সবুজ রঙের কাচওয়ালা চশমা পরেছিলেন। বয়স বোধহয় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। ঠোঁট আর নাকের মাঝখানে একটা ছোট্ট চারকোেনো গোঁফ আছে, যেটাকে বোধহয় ‘ব্যাটারফ্লাই’ বলা হয়। আজকাল এ রকম গোঁফ খুব বেশি দেখা যায় না।

‘বেশ অমায়িক লোক ছিলেন মিস্টার শেলভাঙ্কার।’

‘আপনার সঙ্গে পরিচয় ছিল?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘যেটুকু হয়েছিল তাতেই বুঝেছি। সমঝদার লোক-যাকে বলে রসিক আর কী। আর্টের দিকে খুব ঝোঁক। আমার কাছে একটা তিব্বতি মূর্তি ছিল, সেটা উনি কিনলেন মারা যাবার ঠিক দু দিন আগে।’

‘উনি ওসব জিনিস কালেক্ট করতেন?’

‘কালেক্ট-ফালেক্ট জানি না-আমার সঙ্গে আর্ট এম্পোরিয়ামে আলাপ, দেখি এটা-সেটা ঘেঁটেঘুটে দেখছেন। বললুম, আমার কাছে একটা পুরনো তিব্বতি মূর্তি আছে, তুমি দেখবে? তা বললে, ডাকবাংলোয় নিয়ে এসে। গেলুম নিয়ে, দেখালুম। ভদ্রলোক অন দি স্পট কিনে নিলেন। অবিশ্যি জিনিসটাও ছিল খুব ডিসেন্ট। আমার ঠাকুরদা তিব্বত থেকে এনেছিলেন। নটা মাথা, চৌত্রিশটা হাত।’

‘অই সি।‘

ফেলুদা গভীর ভাব দেখালেও, আমার কিন্তু ভদ্রলোককে বেশ ইন্টারেস্টিং লাগছিল, বিশেষ করে ওর হাসিটা, যেটা ওর ঠোঁটের কোণে লেগেই আছে! শেলভাঙ্কারের মৃত্যুটাও যেন ওর কাছে একটা হাসির ব্যাপার।

‘আমার নাম নিশিকান্ত সরকার।’

ফেলুদা নিজের পরিচয় না দিয়ে কেবল একটা ছোট্ট নমস্কার করল।

ভদ্রলোক বলে চললেন, ‘আমি থাকি দার্জিলিং-এ তিন পুরুষ ধরে আছি আমরা। তবে গায়ের রংটা দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল, তাই না?’

ফেলুদা সামান্য একটু হেসে অভদ্রতা অ্যাভয়েড করল।

‘ও দিকটা, আর কালিম্পংটা থারলি ঘুরে দেখা আছে। সিকিমটা আসা হয়নি। অবিশ্যি সেটা আমার নেগা-মানে নেগলিজেন্স। এসে বুঝছি কী মিস করছিলুম; কাছেপিঠে সব অদ্ভুত জায়গা আছে, জানেন তো? নাকি আপনার সব দেখা?’

ফেলুদা বলল যে সেও নতুন, আজই প্রথম সিকিমের মাটিতে পদার্পণ।

‘বাঃ!’ ভদ্রলোকের এবার প্রায় ছাব্বিশ পাটি দাঁত দেখা গেল। ক’দিন আছেন তো? বেশ ঘুরে-টুরে দেখা যাকে।’

‘ইচ্ছে তো আছে।’

‘পোমিয়াংচিটা শুনিচি দারুণ জায়গা।’

‘যেখানে সিকিমের পুরনো রাজধানীর ভগ্নাবশেষ আছে?’

‘শুধু রাজধানী কেন? গাইডবুকটা দেখুন না। ফরেস্ট আছে, ব্রিটিশ আমলের ডাকবাংলো আছে, প্রাচীন গুম্‌ফা আছে, কাঞ্চনজঙ্ঘার ফাস্টক্লাস ভিউ আছে।–আর কত চাই?’

‘সুযোগ হলে নিশ্চয়ই যাব।’ বলে ফেলুদা উঠে পড়ল।

‘উঠছেন?’

ফেলুদা বলল, ‘যাই, একটু ঘুরে দেখে আসি। এখানে কি বেরোবার সময় ঘরের দরজা-টরজা বন্ধ করে যেতে হয় নাকি?’

'তা হোটেলের ঘরের দরজায় চাবি দেওয়া ভাল। তবে চুরি-চামারি এখানে নেই বললেই চলে। সারা সিকিমে মাত্র একটি জেলখানা, আর সেটা গ্যাংটকেই। খোঁজ নিয়ে দেখুন- চারটির বেশি কয়েদি নেই সেখানে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে দেখি তখনও কুয়াশা কাটেনি। ফেলুদা এদিক-ওদিক দেখে বলল, 'একটা ভুল হয়ে গেল—দুজনের জন্যই এক জোড়া করে হান্টিং বুট কিনে আনা উচিত ছিল। যা বুঝছি, এখানে বাদলা হবে। তার মানেই রাস্তাঘাট পেছল। আর জুতোয় গ্রিপ না থাকলে পাহাড়ে ওঠা মুশকিল।'

আমি বললাম, 'এখানে পাওয়া যাবে না?'

'তা যেতে পারে। বাটার দোকান তো সর্বত্রই আছে। সন্ধে নাগাত ফিরে এসে কিনে নেব। আপাতত চল একটু এক্সপ্লোর করা যাক।'

বাজার থেকে শহরের দিকে যেতে হলে চড়াই উঠতে হয়। কিছু দূর গিয়েই বুঝলাম, এদিকটায় লোকের ভিড় আর বাড়ির ভিড় আরও অনেকটা কম। অল্প যে সব লোক চলাচল করছে, তার মধ্যে কিছু স্কুলের ইউনিফর্ম-পরা ছেলে মেয়েও দেখলাম। দার্জিলিং-এর মতো ঘোড়া দেখলাম না। এখানে, তবে জিপ চলে ওখানের চেয়ে অনেক বেশি। সেটা বোধহয় মিলিটারিরা থাকার দরুন। গ্যাংটক থেকে ষোলো মাইল দূরে ১৪,০০০ ফুট হাইটে নাথুলা। নাথুলাতে চিন আর ভারতের মধ্যের সীমারেখা। এদিকে ভারতীয় সৈন্য, আর ওদিকে পঞ্চাশ গজের মধ্যে চিন সৈন্য।

আরও কিছু দূর হেঁটে যাবার পর একটা মোড়ের মাথায় এসে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হঠাৎ একটা ঝলমলে রং চোখে পড়ল। একটু এগোতেই বুঝলাম সেটা আর কিছুই না—একটা লোক, ভারী বাহারের পোশাক পরে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার পা থেকে মাথা অবধি রঙের বাহার। পায়ে হলদে জুতো, প্যান্টটা হল নীল রঙের জিনস, সোয়েটারটা টকটকে লাল, আর তার গলার ফাঁক দিয়ে ভিতরে সবুজ শার্টের কলার দুটো

বেরিয়ে আছে। শার্টের ঠিক উপরেই, থুতনির নীচে, একটা সাদার উপর কালো নকশা করা স্কার্ফ। লোকটার মুখের রং হালকা হলদে আর ফ্যাকাসে গোলাপি মেশানো, আর চুল—শুধু চুল নয়, গোঁফদাড়িও-বাদামি রঙের। দেখেই বোঝা যায় ইনি একজন বিদেশি হিপি। দাড়ি থাকার ফলে বয়স বোঝা মুশকিল, তবে মুখের চামড়া একটুও কুঁচকোয়নি। মনে হয় ফেলুদারই বয়সী—মানে ত্রিশের একটু নীচেই।

ভদ্রলোক আমাদের দেখে মৃদু হেসে ঠাণ্ডা মোলায়েম সুরে বললেন, 'হ্যালো।'

ফেলুদাও উত্তরে 'হ্যালো' বলল। এবার লক্ষ করলাম হিপির কাঁধ থেকে দুটো ক্যামেরা ঝুলছে, আর তার সঙ্গে একটা চামড়ার ব্যাগে। তাতেও হয়তো ক্যামেরারই জিনিসপত্র রয়েছে। একটা ক্যামেরার নাম 'ক্যানন' দেখে বুঝলাম সেটা জাপানি। ফেলুদার সঙ্গেও তার জাপানি ক্যামেরাটা ছিল, আর সেটা দেখেই বোধহয় হিপি বললেন, 'নাইস ডে ফর কালার।'

ফেলুদা হেসে বলল, 'তোমাকে কিছু দূর থেকে কুয়াশার মধ্যে দিয়ে দেখে আমারও সেই কথাটাই মনে পড়ছিল, তবে দুঃখের বিষয় ভাল কালার ফিল্ম এখন আমাদের দেশে দুষ্প্রাপ্য না হলেও দুর্মূল্য।'

হিপি বলল, 'সেটা জানি। আমার কাছে কালারের স্টক আছে, প্রয়োজন হলে আমাকে বোলো।'

হিপি যদিও ইংরেজিতে কথা বলছিল, উচ্চারণ শুনে তার জাতটা বুঝতে পারলাম না। ফরাসি অথবা আমেরিকান হলে চন্দ্রবিন্দুটা একটু বেশি ব্যবহার করত, আর ইংরেজ হলে তো বোঝাই যেত। ইনি কিন্তু ওই তিনটি জাতের একটিও নন।

ফেলুদা বলল, 'তুমি কি বেড়াতে এসেছ?'

হিপি বলল, ‘আমি ছবি তুলতে এসেছি। সিকিম সম্বন্ধে একটা বই করার ইচ্ছে। আমি একজন প্রেফেশনাল ফটোগ্রাফার।’

‘কদিন আছে। এখানে?’

‘এসেছি নাইনথ; পাঁচদিন হল। তিনদিনের ভিসা ছিল, বলে-কয়ে বাড়িয়ে নিয়েছি। আরও দিন-সাতেক থাকার ইচ্ছে।’

‘কোথায় উঠেছ?

‘ডাকবাংলো। এই যে রাস্তাটা ডান দিকে উঠে গেছে-এইটে দিয়ে একটু উঠে গিয়েই ডাকবাংলো।’

ডাকবাংলো শুনেই আমার কানটা খাড়া হয়ে উঠল। শেলভাঙ্কারও তো বোধহয় ডাকবাংলোতেই ছিলেন।

‘তা হলে যে-ভদ্রলোকটি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেলেন, তার সঙ্গে তোমার নিশ্চয়ই আলাপ ছিল?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

হিপি আক্ষেপের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বুললেন, ‘ভেরি স্যাড। আমার সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হয়েছিল। হি ওয়াজ এ ফাইন ম্যান, অ্যান্ড-’

এইটুকু বলেই হিপি থেমে গেল। দেখে মনে হল সে হঠাৎ কেন জানি চিন্তিত হয়ে পড়েছে। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সে প্রায় আপন মনেই বলল, ‘ভেরি স্ট্রেঞ্জ।’

‘কী ব্যাপার?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘উনি এখানে এসে একটা আশ্চর্য মূর্তি সংগ্রহ করেছিলেন একটি বাঙালি ভদ্রলোকের কাছ থেকে। হি পেড ওয়ান থাউজ্যান্ড রুপিজ ফর ইট।’

‘এক হাজার!’ ফেলুদা অবাক হয়ে বলল।

‘হ্যাঁ। জিনিসটা কেনার পর ও এখানকার টিবেটন ইনস্টিটিউটে সেটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। তারা নাকি বলেছিল মূর্তিটা একটা আশ্চর্য উঁচু দরের দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কিন্তু ভদ্রলোক গভীর হয়ে আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, ‘আমার খটকা লাগছে। এই ভেবে যে, মূর্তিটা গেল কোথায়?’

‘তার মানে?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল। ‘তার ডেড বডি তো শুনলাম বম্বে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুতরাং তার জিনিসপত্রও নিশ্চয়ই সেই সঙ্গেই গেছে।–তাই নয় কি?’

হিপি মাথা নাড়ল।’অন্য সব জিনিস ফেরত গেছে সেটা ঠিকই, কিন্তু মিস্টার শেলভাঙ্কার মূর্তিটা সব সময়ে তাঁর কোটের বুক-পকেটে রাখতেন। বলতেন, এটা আমার ম্যাসকট–আমার ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে। সেদিন যখন বেরোন, তখনও সেটা ওঁর পকেটেই ছিল। এটা আমি জানি! অ্যাক্সিডেন্টের পর ওঁকে হাসপাতালে আনা হয়; তখন আমি সেখানে ছিলাম। ওঁর জামাকাপড় খুলে ওঁর পকেট থেকে সব জিনিসপত্র বার করে ফেলা হয়। একটা নোটবুক বেরোয়, মানিব্যাগ বেরোয়, খাপের মধ্যে ভাঙা অবস্থায় ওঁর চশমাটা বেরোয়, কিন্তু মূর্তি বেরোয়নি। অবিশ্যি এমন হতে পারে যে, মূর্তিটা পকেট থেকে বেরিয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছিল; হয়তো সেটা সেখানেই পড়ে আছে, আর না হয় যারা তাকে তুলে আনে তাদেরই কেউ সেটাকে পকেটস্থ করেছে।‘

‘কিন্তু এখানের লোকেরা তো শুনেচি খুব অনেস্ট।’

‘সেইজন্যেই তো গোলমাল লাগছে৷’ হিপি থুতনিতে হাত দিয়ে মাথা হেঁট করে কিছুক্ষণ ভাবল।

ফেলুদা বলল, ‘মিস্টার শৈলভাস্কার সেদিন কোথায় যাচ্ছিলেন সেটা জানেন?’

‘সিংগিকের রাস্তায় একটা গুম্‌ফা আছে, সেখানে আমারও যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু সেদিন সকালে উঠে। দিনটা ভাল দেখে আমি ওঁর অনেক আগেই ক্যামেরা নিয়ে ছবি তুলতে বেরিয়ে পড়ি। উনি বলেছিলেন—পথে যদি তোমাকে দেখি তা হলে তুলে নেব।’

‘হঠাৎ গুম্‌ফা সম্পর্কে আগ্রহ কেন?’

‘সেটা ঠিক জানি না। বোধ হয় ডক্টর বৈদ্য এর জন্য কিছুটা দায়ী।’

‘ডক্টর বৈদ্য?’ ফেলুদা প্রশ্ন করল। নামটা এই প্রথম শুনছি।

হিপি হেসে বলল, ‘ এইভাবে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলার কোনও মানে হয় কি? চলো, ডাকবাংলোয় চলো-কফি খাবে।’

ফেলুদা আপত্তি করল না। বুঝলাম ও শেলভাঙ্কার সম্বন্ধে যা কিছু জানিবার সব জেনে নিতে চাইছে।

ডান দিকের চড়াই রাস্তাটা দিয়ে উঠতে উঠতে হিপি বলল, ‘তা ছাড়া আমার পা-টাকেও একটু রেস্ট, দেওয়া দরকার। সেদিন পাহাড়ে উঠতে গিয়ে স্লিপ করে একটু মচকেছে। বেশিক্ষণ একটানা দাঁড়িয়ে থাকলে টনটন করে।’

কুয়াশা হালকা হয়ে আসছে। চারদিকে যে এত গাছপালা ছিল, তা এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। হালকা হয়ে আসা কুয়াশার ফাঁক দিয়ে এখন পাইন গাছের মাথাগুলো দেখা যাচ্ছে।

খানিক দূর হেঁটেই আমরা ডাকবাংলো পৌঁছে গেলাম। বেশ সুন্দর একতলা বাড়ি; বেশিদিনের পুরনো বলেও মনে হল না।

হিপি তার ঘরে নিয়ে গিয়ে দুটো চেয়ারের উপর থেকে কাগজপত্র সরিয়ে আমাদের বসবার জায়গা করে দিয়ে বলল, ‘আমার পরিচয়টাই এখনও দেওয়া হয়নি। আমার নাম হেলমুট উঙ্গার।’

‘জার্মান নাম কি?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘ঠিকই ধরেছ।’ হেলমুট তার খাটেই বসল। ঘরের চারিদিকে জিনিসপত্র ছড়ানো, আলনায় আরও রংচাঙে পোশাক, বাক্সগুলো আধাখোলা, তার মধ্যে কাপড়ের চেয়ে কাগজপত্র ম্যাগাজিন ইত্যাদিই বেশি। কিছু ফোটো রাখা রয়েছে টেবিলের উপর, দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড় করানো অবস্থায়। বেশির ভাগই বিদেশের ছবি, কিছু এদেশে তোলা। আমি খুব বেশি বুঝি না, তবে দেখে মনে হল ছবিগুলো বেশ ভাল।

ফেলুদাও নিজের পরিচয় দিল, যদিও সে যে শখের ডিটেকটিভ সে কথা বলল না। তারপর হেলমুট ‘এক্সকিউজ মি’ বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বোধ হয় কফির অডার দিয়ে ফিরে এসে আবার খাটে বসে বলল, ‘ডক্টর বৈদ্য ভারী ইন্টারেস্টিং লোক, তবে কথাটা একটু বেশি বলেন। ডাকবাংলোতেই এসে ছিলেন কয়েকদিন। ভাগ্য গণনা জানেন, ভবিষ্যৎ বলতে পারেন, যে লোক মরে গেছে তার আত্মার সঙ্গে যোগস্থাপন করতে পারেন।’

‘প্লানচেট জাতীয় ব্যাপার?’

‘কতকটা তাই! মিস্টার শেলভাঙ্কারকে অনেক কিছু বলে ভারী আশ্চর্য করে দিয়েছিলেন। আর পরলোকতত্ত্ব সম্বন্ধে মনে হল অনেক পড়াশুনা আছে।’

‘তিনি এখন কোথায়?’

‘কালিম্পং যাবার কথা ছিল। সেখানে নাকি কোনও এক তিব্বতি সাধুর সঙ্গে অ্যাপিয়েন্টমেন্ট ছিল। বলেছেন তো অ্যাবার আসবেন।’

'মিস্টার শেলভাঙ্কারকে কী বলেছিলেন তিনি? আপনি শুনেছেন সে সব কথা?'

'আমার সামনেই কথাবার্তা হয়। তার ব্যবসার কথা বললেন, স্ত্রীর মৃত্যুর কথা বললেন, ছেলের কথা বললেন। এমনকী, তিনি যে কিছুদিন থেকে মানসিক উদ্বেগে ভুগছেন। সে কথাও বললেন।'

'সেটা কী কারণে?'

'তা জানি না।'

'আপনাকে কিছু বলেননি?'

'না। তবে বুঝতে পারতাম। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন, দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। একদিন বারান্দায় বসে চা খাচ্ছিলাম, এমন সময় ওঁর একটা টেলিগ্রাম আসে। উনি সেটা পড়ে রীতিমতো আপসেট হয়ে পড়েন।'

ফেলুদা বলল, 'মিস্টার শেলভাঙ্কার যে আকস্মিকভাবে মারা যাবেন, এ নিয়ে ডক্টর বৈদ্যু কোনও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন?'

'ঠিক ভবিষ্যদ্বাণী না করলেও, একটা সপ্তাহ একটু সাবধানে থাকতে বলেছিলেন। বলেছিলেন তার সময় ভাল যাচ্ছে না।'

কফি এল। আমরা তিনজনেই চুপচাপ বসে খেলাম। শেলভাঙ্কারের মৃত্যুর মধ্যে কোনও রহস্য আছে কি না জানা না গেলেও, আমার মন বলছিল কোথায় যেন একটা গণ্ডগোল রয়েছে। আমার বিশ্বাস ফেলুদারও আমার মতোই মনের অবস্থা। কারণ আগেও দেখেছি যে ওর মনে যখন একটা সন্দেহ জাগে, তখন ও চুপচাপ বসে থাকার ফাঁকে ফাঁকে আঙুল মটকায়। এখনও সে আঙুল মটকাচ্ছে।

কফি শেষ করে ফেলুদা ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়ল। বলল, ‘তুমি যখন আরও দিন-সাতেক রয়েছ, তখন নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে। ডক্টর বৈদ্য যদি আসেন তা হলে যেন একটা খবর পাই। আমরা স্নো-ভিউ হোটেলে আছি।’

হেলমুট আমাদের সঙ্গে বাংলোর গেট পর্যন্ত এল। গুডবাই করার সময় সে শুধু একটা কথাই বলল; ‘মূর্তিটা কোথায় গেল সেটা জানতে পারলে খানিকটা নিশ্চিন্ত লাগত।’

৩. কুয়াশা কাটলে কী হবে

কুয়াশা কাটলে কী হবে, আকাশে মেঘ এখনও কাটেনি। অল্প অল্প বিরঝিরে বৃষ্টিও পড়ছিল, তবে এ রকম বৃষ্টি ভালই লাগে। ছাতার দরকার হয় না, গা ভিজল কি না ভিজল বোঝাই যায় না, অথচ শরীরটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

বাটার দোকানটা দেখলাম আমাদের হোটেল থেকে খুব বেশি দূরে নয়। দুজনের জন্য হান্টিং বুট কেনা হলে পর ফেলুদা বলল, 'রাস্তাঘাট যখন জানা নেই, তখন আজকের দিনটা অন্তত ট্যাক্সি ছাড়া গতি নেই। আপাতত টিবেটান ইনস্টিটিউট। দুর্দান্ত সব থাঙ্কা, পুঁথি আর তান্ত্রিক জিনিসপত্রের সংগ্রহ আছে শুনেছি।'

' তোমার মনে কি কোনও সন্দেহ হচ্ছে? উত্তর পাব কি না জানি না, তাও প্রশ্নটা না করে পারলাম না।

'কীসের সন্দেহ?'

'যে মিস্টার শেলভাঙ্কার স্বাভাবিকভাবে মারেননি।'

'এখনও সেটা ভাববার বিন্দুমাত্র কারণ ঘটেনি।'

'তবে যে মূর্তিটা পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তাতে কী হল? লোকটা পাথর চাপা পড়ে জখম হয়েছে, পকেট থেকে মূর্তি গড়িয়ে পড়েছে, যারা তাকে উদ্ধার করেছে তাদের মধ্যে কেউ সেটিকে দেখতে পেয়ে ট্যাঁকস্থ করেছে–ব্যস ফুরিয়ে গেল। খুন করা এমনিতেই সহজ না, তার উপর মাত্র এক হাজার টাকার একটা মূর্তির জন্যে খুন–এ তো ভাবাই যায় না।'

আমি আর কিছু বললাম না। খালি মনে মনে বললাম—একটা রহস্য যদি গজিয়ে ওঠে, তা হলে ছুটিটা জমবে ভাল।

সারি সারি দাঁড়ানো জিপের একটার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার নেপালি ড্রাইভারকে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'ভাড়া যায়গা?'

লোকটা বলল, 'কাঁহা যায়গা?'

'টিবেটান ইনস্টিটিউট মালুম হ্যায়?

'হ্যায়। বৈঠ যাইয়ে।'

আমরা দুজনেই সামনে ড্রাইভারের পাশের সিটে বসলাম। ড্রাইভারটা গলায় মাফলারটা জড়িয়ে নিয়ে মাথায় একটা কাপ চাপিয়ে, জিপটা ঘুরিয়ে যো-পথে আমরা শহরে এসে ঢুকেছিলাম, সেই পথে উলটোমুখে চলতে লাগল।

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে লোকটার সঙ্গে বাতচিত আরম্ভ করে দিল। কথা অবিশ্যি হিন্দিতেই হল; আমি সেটা বাংলায় লিখছি।

'এখানে সেদিন যে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে সেটার কথা তুমি জান?'

'সবাই জানে।'

'সে ড্রাইভার তো বেঁচে আছে, তাই না?'

'ওঃ-ওর খুব ভাগ্য ভাল। গত বছর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়, সেও পাথর পড়ে—তাতে

'তুমি এ ড্রাইভারকে চেন?'

'চিনব না? এখানে সবাই সবাইকে চেনে।'

'সে কী করছে এখন?'

'আবার অন্য একটা ট্যাক্সি চালাচ্ছে—SKM 463। নতুন ট্যাক্সি।'

'অ্যাক্সিডেন্টের জায়গাটা তুমি দেখেছ?ট

'হ্যাঁ, ও তো নর্থ সিকিম হাইওয়েতে। এখান থেকে দশ কিলোমিটার।'

'কাল একবার নিয়ে যেতে পারবে?'

'কোন পারব না?'

'তা হলে এক কাজ করো। আটটা নাগাত বেরোব—সকালে। আমরা স্নো-ভিউ হোটেলে থাকি—তুমি চলে এসো।'

'বহুৎ আচ্ছা।'

একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে খাড়াই পথ ধরে উঠে গিয়ে টিবেটান ইনস্টিটিউট। ড্রাইভার বলল জঙ্গলে নাকি খুব ভাল আর্কিড আছে—কিন্তু সে সব দেখবার সময় এখন নয়। গাড়ি একেবারে সোজা ইনস্টিটিউটের দরজার সামনে গিয়ে থামল। প্রকাণ্ড দোতলা বাড়ি, তার গায়ে বোধহয় তিব্বতি ধাঁচেরই সব নকশা করা। চারদিক এত নির্জন আর নিস্তব্ধ যে, একবার মনে হল ইনস্টিটিউট হয়তো বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি দরজা খোলা।

দরজা দিয়ে ঢুকেই দেখি একটা প্রকাণ্ড হলঘরে এসে পড়েছি, তার দেয়ালে লম্বা লম্বা ছবি ঝুলছে (এগুলোকেই বলে থাঙ্কা), আর মেঝেতে রয়েছে। নানারকম খুঁটিনাটি জিনিসপত্রে বোঝাই সারি সারি কাচের আলমারি আর শো-কেস।

কোনদিকে যাব বুঝতে পারছি না, এমন সময় একজন ঢোল সিকিমি পোশাক আর চশমা-পরা ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

ফেলুদা তাকে ভীষণ ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, 'ডক্টর গুপ্ত আছেন কি?'

ভদ্রলোক ইংরেজিতে উত্তর দিলেন, 'দুঃখের বিষয় কিউরেটর সাহেব আজ অসুস্থ। আমি তাঁর অ্যাসিসট্যান্ট। কীভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি, বলুন।'

ফেলুদা বলল, 'না, মানে, একটা বিশেষ ধরনের তিব্বতি মূর্তি সম্বন্ধে আমি একটু ইনফরমেশন চাচ্ছিলাম। নামটা জানি না, তবে কোনও এক দেবতার মূর্তি। তার ন'টা মাথা আর চৌত্রিশটা হাত।'

ভদ্রলোক হেসে মাথা নেড়ে বললেন, 'ইয়েস ইয়েস—যমন্তক, যমন্তক। টিবেট ইজ ফুল অফ স্ট্রেঞ্জ গডস। আমাদের কাছে একটা যমন্তকের মূর্তি আছে, এসো দেখাচ্ছি। কিন্তু ওর বেস্ট স্পেসিমেন এই কিছুদিন আগে একটি ভদ্রলোক আমাদের দেখাতে এনেছিলেন। আনফরচুনেটলি হি ইজ ডেড নাউ।'

'আই সি।'

প্রয়োজনে ফেলুদার অ্যাকটিং দেখবার মতো।

আমরা ভদ্রলোকের পিছন পিছন একটা আলমারির দিকে এগিয়ে গেলাম। যে মূর্তিটা ভদ্রলোক বার করে আমাদের সামনে ধরলেন সেটার চেহারা ভয়ঙ্কর। ন'টা মুখের প্রত্যেকটাতেই একটা হিংস্র ভাব-প্রায় রাক্ষসের মতো।

এবার ভদ্রলোক মূর্তিটাকে চিত করে দেখালেন তার তলায় একটা ফুটো। এই ফুটোর ভিতরে নাকি মন্ত্র লেখা কাগজ পাকিয়ে ঢুকিয়ে রাখা হয়, আর তাকে বলে নাকি 'সেক্রেড ইনটেসটাইন।'

মূর্তিটাকে আলমারিতে রেখে ভদ্রলোক বললেন, 'যিনি মারা গেছেন, তাঁর মূর্তিটা ছিল মাত্র তিন ইঞ্চি লম্বা, কিন্তু কী আশ্চর্য সুন্দর কারুকার্য! সোনার মূর্তি, আর তাতে

নানারকম পাথর বসানো। চোখ দুটো ছিল রুবি পাথরের। আমরা এত সুন্দর মূর্তি এর আগে কখনও দেখিনি।'

ফেলুদা বলল, 'কী রকম দাম হতে পারে সে মূর্তির?'

ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'হি পেড় এ থাউজ্যান্ড রুপিজ। আমার মতে জলের দরে পেয়েছিলেন। ওর দাম দশ হাজার টাকা হলেও বেশি হত না। আমাদের কিউরেটার নিজে তিব্বত গেছেন, দলাইলামার সঙ্গে বসে মড়ার মাথার খুলিতে চা খেয়েছেন, কিন্তু তিনিও অত ভাল মূর্তি কখনও দেখেননি।'

ভদ্রলোক এর পরে আমাদের আরও অনেক জিনিস দেখিয়ে অনেক কিছু বোঝালেন। ফেলুদা সে সব মন দিয়ে শুনলেও, আমার কোনও কথাই কানে ঢুকাল না; আমি শুধু ভাবছি–শেলভাঙ্কারের মূর্তির দাম ছিল দশ হাজার টাকা। এক হাজার নয়, দশ হাজার। দশ হাজার টাকার মূর্তির লোভে কি একজন আরেকজনকে খুন করতে পারে না? অবিশ্যি তার পরেই আবার মনে পড়ল যে পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ে তার জিপে লাগার ফলেই শেলভাঙ্কার মারা গিয়েছিল। তাই যদি হয়, তা হলে তো খুনের কথাটা আসেই না।

টিবেটান ইনস্টিটিউট থেকে বেরোবার সময় আমাদের গাইড ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'যমন্তক সম্বন্ধে হঠাৎ লোকের এত কৌতুহল কেন বুঝতে পারছি না! তোমরা ছাড়া আরেকজন জিজ্ঞেস করে গেছে।'

'যিনি মারা গেছেন। তিনি কি?'

'না না। তাঁর কথা বলছি না। আরেকজন।'

'কে মনে পড়ছে না?'

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ ভেবে মাথা নেড়ে বললেন, 'নাঃ–শুধু প্রশ্নটা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ছে না। আসলে সেদিন এখানে একদল আমেরিকান এসেছিলেন, আমাদের চোগিয়ালের অতিথি–তাদের নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম...'

ইনস্টিটিউট থেকে বেরিয়ে যখন জিপে উঠছি, তখন দেখি চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঘড়িতে পাঁচটা বাজাতে পাঁচ মিনিট। দিনের আলো এত শিগগির যাবার কথা নয়। জিপ জঙ্গল থেকে খোলা জায়গায় বেরোনো মাত্র বুঝতে পারলাম পশ্চিমে ঘন কালো মেঘই এই অন্ধকারের কারণ। ড্রাইভার বলল, 'দিনের বেলাটা এখানে অনেক সময়ই ভাল যায়, যত দুযোগ রাত্তিরে।' আজ আর ঘোরাঘুরির কোনও মানে হয় না, তাই আমরা হোটেলে ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম।

গাড়িতে ফেলুদা কোনও কথা বলল না। ও যে কী ভাবছে তা বোঝার কোনও উপায় নেই, তবে ওর চোখ যে কাজ করে চলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। চলন্ত গাড়ির জানালার বাইরের সব কিছুর দিকেই ওর সজাগ দৃষ্টি। কোনও নতুন জায়গায় এলেই, আগেও দেখেছি, ফেলুদা এইভাবেই প্রায় জায়গাটাকে গিলে খায়। আরেক দিন যদি আমরা এ রাস্তা দিয়ে যাই, আমার বিশ্বাস ফেলুদার পর পর সব দোকানের নামই মুখস্থ হয়ে যাবে। আমি যে কবে ফেলুদার চোখ আর মেমরি পাব তা জানি না। অবিশ্যি আমার বয়স এখন মাত্র পনেরো, আর ওর আঠাশ।

হোটেলে পৌঁছে যখন জিপের ভাড়া দিচ্ছি তখন আবার শশধরবাবুর সঙ্গে দেখা। এখনও সেই ব্যস্ত অন্যমনস্কভাবে বাজারের দিক থেকে ফিরছেন। প্রথমে আমাদের দেখতেই পাননি, তারপর ফেলুদার ডাক শুনে একটু চমকে হেসে আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

'সব ব্যবস্থা হয়ে গেল! কালকের ফ্লাইটেই যাচ্ছি।'

ফেলুদা বলল, 'বম্বে গিয়ে একটা ব্যাপারে একটু খোঁজ করে দেখতে পারেন কি? মিস্টার শেলভাঙ্কার এখানে একটা তিব্বতি মূর্তি কিনেছিলেন। একটা মূল্যবান দুপ্রাপ্য স্পেসিমেন। সেই মূর্তিটা তাঁর জিনিসপত্রের সঙ্গে ফেরত গেছে কি না।'

শশধরবাবু বললেন, 'নিশ্চয়ই দেখব। কিন্তু আপনি ব্যাপারটা জানলেন কী করে?'

ফেলুদা সংক্ষেপে নিশিকান্তবাবু আর হিপির কাছে যা জেনেছে সেটা বলল। সব শুনেটুনে শশধরবাবু বললেন, 'বুক পকেটে মূর্তিটা রাখাটাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে। হি হ্যান্ড এ গ্রেট প্যাশন ফর আর্ট অবজেক্টস।'

তারপর হঠাৎ মুখের ভাব একদম বদলে ফেলুদার দিকে চেয়ে একটা অবাক হাসি হেসে বললেন, 'ভাল কথা—আপনি যে ডিটেকটিভ সেটা তো আমাকে বলেননি৷'

আমার তো চক্ষু ছানাবড়া! ফেলুদারও দেখি মুখ হা হয়ে গেছে।

'কী করে জানলেন?'

ভদ্রলোক হাসতে হাসতে তাঁর মানিব্যাগ থেকে একটা কার্ড বার করে ফেলুদাকে দেখালেন। আমি জানি সেটা ফেলুদারই কার্ড; তাতে লেখা আছে Prodosh, C. Mitter, Private Investigator.

'আপনি যখন জিপের শেয়ারটা দিচ্ছিলেন, তখনই বোধহয় আপনার কার্ডটা ব্যাগ থেকে সামনের সিটে পায়ের কাছে পড়ে গিয়েছিল। বাংলোয় যখন নামছি, তখন ড্রাইভারটা আমায় কার্ডটা দেয়। ভাল করে পড়ে দেখিনি, কারণ চশমাটা ছিল না হাতের কাছে। তারপর থেকে যা গণ্ডগোল—এটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। এনিওয়ে, এটা আমি রাখছি।-আর এই নিন আমার কার্ড! যদি কোনও গোলমাল দেখেন, আর মনে করেন আমার আসা দরকার-একটা টেলিগ্রাম করে দেবেন—আলিয়েস্ট অ্যাভেইলেবল ফ্রাইটে চলে আসব।'

'কখন যাচ্ছেন। আপনি?'

'কাল ভোরে। হয়তো আপনাদের সঙ্গে আর দেখা হবে না। আসি। হ্যাভ এ গুড টাইম।'

বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে আরম্ভ করেছে। ভদ্রলোক হাত তুলে গুড বাই করে হনহনিয়ে বাংলোর দিকে চলে গেলেন।

ঘরে এসে ফেলুদা বুট-মোজা খুলে হাত-পা ছড়িয়ে খাটের উপর শুয়ে পড়ে বলল—উফ্ ফ!

সত্যিই, আজ এই প্রথম দিনে এত রকম ঘটনা ঘটল যে উষ্ণু ছাড়া আর কিছু বলা যায় না।

'ভেবে দ্যাখ', ফেলুদা সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা ক্রিমিন্যালের যদি ন'টা মাথা হত তা হলে কী সাংঘাতিক ব্যাপার হত। পেছন থেকে এসে খপ করে ধরার আর কোনও উপায় থাকত না।'

'আর চৌত্রিশটা হাত?'

'সেও সাংঘাতিক। চৌত্রিশ জোড়া হাতকড়া না হলে অ্যারেস্ট করা যেত না।'

বাইরে বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে।

ঘরের আলোটা জ্বলিয়ে দিলাম।

ফেলুদা তার হাতবাক্সটা খুলে তার থেকে তার বিখ্যাত নীল খাতাটা বের করল। তারপর শোয়া অবস্থাতেই খাতাটা খুলে বুকের উপর রেখে পকেট থেকে কলামটা বার করে

লেখার জন্য তৈরি হল। শেলভাঙ্কার যেভাবেই মরে থাকুক না কেন, ফেলুদা যে অলরেডি রহস্যের গন্ধ পেয়েছে আর তদন্ত শুরু করে দিয়েছে, সেটা আমার বুঝতে বাকি রইল না।

'বল তো, এখানে এসে এখন পর্যন্ত কার কার সঙ্গে আলাপ হল?'

প্রশ্নটার জন্য মোটেই তৈরি ছিলাম না, তাই প্রথমটা কী রকম হকচকিয়ে গেলাম। ঢোক গিলে বললাম, 'একেবারে বাগডোগরা থেকে শুরু করতে হবে নাকি?'

'দূর গর্দভ। এখন যারা গ্যাংটকে রয়েছে, তার মধ্যে বল।'

'এক—শশধরবাবু।'

'পদবি?'

'দত্ত।'

'তোর মুণ্ডু।'

'সরি–বোস।'

'কেন এসেছেন। এখানে?'

'ওই যে বললেন কী সুগন্ধী গাছের ব্যাপার।'

'অতি দায়সারাভাবে বললে চলবে না।'

'দাঁড়াও। ভদ্রলোকের পাটনার মিস্টার শৈলভাঙ্কারকে মিট করতে। ওদের একটা কেমিক্যাল কোম্পানি আছে, যার অনেক কাজের মধ্যে একটা কাজ হল—'

'ও কে–ও কে; নেক্সট?'

‘হিপি।‘

‘নাম?’

‘হেলমেট–‘

‘মুট। মেট নয়। হেলমুট।’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ।’

‘পদবি?’

‘উঙ্গার

‘আসার উদ্দেশ্য?’

‘প্রোফেশনাল ফোটোগ্রাফার। সিকিমের ছবি তুলে একটা বই করতে চায়। তিনদিনের ভিসা পেয়েছিল, বলে-কয়ে বাড়িয়ে নিয়েছে।’

‘নেক্সট?’

‘নিশিকান্ত সরকার। দার্জিলিং-এ থাকেন। তিন পুরুষের বাস। কী করেন জানি না। একটা তিব্বতি মূর্তি ছিল, শেলভাঙ্কারকে–’

দরজায় টোকা পড়ল।

‘কাম ইন ‘ ফেলুদা ভীষণ সাহেবি কায়দায় বলে উঠল।

‘ডিসটার্ব করছি না তো?’ নিশিকান্ত সরকারের প্রবেশ! ‘একটা খবর দিতে এলুম।’

ফেলুদা সোজা হয়ে বসে ভদ্রলোককে খাটের পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে দিল। নিশিকান্তবাবু তার সেই অদ্ভুত হাসি নিয়ে চেয়ারে বসে বললেন, 'কাল লামা ডান্স হচ্ছে।'

'কোথায়?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'রুমটেক। এখান থেকে মাত্র দশ মাইল। দারুণ ব্যাপার। ভুটান কালিম্পং থেকে সব লোক আসছে। রুমটেকের যিনি লামা—তাঁর পোজিশন খুব হাই-জানেন দলাই, পাঞ্চেন, তারপরেই ইনি। ইনি তিব্বতেই থাকতেন। ইদানীং এসেছেন। মঠটাও নতুন। একবার দেখে আসবেন নাকি?'

'সকালে হবে না।' ফেলুদা ভদ্রলোককে একটা চারমিনার অফার করল।'দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে যাওয়া যেতে পারে।' ,

'অ্যার পরশু। যদি যান, তা হলে হিজ হোলিনেস-এর দর্শনও পেতে পারেন। বলেন তো গুটি চারেক সাদা স্কার্ফ জোগাড় করে রাখি।'

আমি বললাম, 'স্কার্ফ কেন?'

নিশিকান্ত হেসে বললেন, 'ওইটেই এখানকার রীতি। হাইক্লাস কোনও তিব্বতির সঙ্গে দেখা করতে গেলে স্কার্ফ নিয়ে যেতে হয়। তুমি গিয়ে তাঁকে স্বার্ফটা দিলে, তিনি আবার সেটা তোমাকে ফেরত দিলেন–বাস, ফরম্যালিটি কমপ্লিট।'

ফেলুদা বলল, 'লামাদর্শনে কাজ নেই। তার চেয়ে নাচটাই দেখা যাবে।'

'আমারও তাই মত। আর গেলে কালই যাওয়া ভাল। যা দিন পড়েছে, এর পরে রাস্তাঘাটের কী অবস্থা হবে বলা যায় না।'

'ভাল কথা।–আপনি আপনার মূর্তির কথা কি শৈলভাস্কার ছাড়া আর কাউকে লছিলেন?'

নিশিকান্তবাবুর জবাব দিতে দেরি হল না।'ঘুণাক্ষরেও না। নট এ সোল। কেন বলুন তো?'

'না-এমনি জিজ্ঞেস করছি।'

'এখানকার দোকানে গিয়ে ওটা একবার যাচাই করব ভেবেছিলাম, তবে তারও প্রয়োজন হয়নি। দোকানেই শেলভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ হয়, তারপর সোজা ডাকবাংলোয় গিয়ে জিনিসটা দিয়ে আসি। অবিশ্যি উনি একদিন রেখে তারপর দামটা দিয়েছিলেন।'

'নগদ টাকা?'

'না না। সেটা হলে আমার সুবিধেই হত, কিন্তু ক্যাশ ছিল না ওঁর কাছে। চেক দিয়েছিলেন। দাঁড়ান—'

নিশিকান্তবাবু তাঁর ওয়ালেট থেকে একটা ভাঁজ করা চেক বার করে ফেলুদাকে দেখালেন। আমিও ঝুকে পড়ে দেখে নিলাম। ন্যাশনাল অ্যান্ড গ্রিন্ডলেজ ব্যাঙ্কের চেক-তলায় দারুণ পাকা সই-এস শেলভাঙ্কার।

ফেলুদা চেকটা ফেরত দিয়ে দিল।

'কোথাও কোন সাস-মানে, সাসপিশাস কিছু দেখলেন নাকি?' মুখে সেই হাসি নিয়ে নিশিকান্তবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

'নাঃ!'ফেলুদা হাই তুলল। ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। বাইরে একটা চোখ-ঝলসানো নীল বিদ্যুতের পর একটা প্রচণ্ড বাজের শব্দে ঘরের কাচের জানালা ঝন ঝন করে উঠল। নিশিকান্তবাবু দেখলাম ফ্যাকাসে হয়ে গেছেন।

'বাজ জিনিসটাকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারি না, হেঁ হেঁ। আসি...'

যখন ডিনার খাচ্ছি তখনও বৃষ্টি, যখন শুতে গেলাম তখনও বৃষ্টি, যখন ঘুমোচ্ছি তখনও এক-একবার বাজের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেছে—আর বৃষ্টির শব্দ পেয়েছি। একবার ঘুম

ভেঙে জানালার দিকে চোখ পড়াতে মনে হল, কে যেন জানালার বাইরের কাঠের বারান্দা দিয়ে হেঁটে গেল। কিন্তু এই দুর্যোগের রাতে কে আর বাইরে বেরোবে? নিশ্চয়ই আমার দেখার ভুল। কিংবা হয়তো ঘুমাই ভাঙেনি। পাহাড়ের দিকের জানালার কাচের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের আলোয় দেখা লাল পোশাক পরা লোকটা হয়তো আসলে আমার স্বপ্নে দেখা।

৪. ভোরে বৃষ্টি থেমেছে

কোন ভোরে বৃষ্টি থেমেছে জানি না। সাড়ে ছ'টায় উঠে জানালার কাছে গিয়ে দেখি আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার, চারিদিকে রোদ-ঝলমল, আর আমার ঠিক সামনের পাহাড়ের সারির পিছন দিয়ে মাথা উচিয়ে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা। দার্জিলিং-এর চেয়ে অন্য রকম দেখতে, হয়তো অত সুন্দরও না, কিন্তু তা হলেও চেনা যায়, তা হলেও কাঞ্চনজঙ্ঘা।

ফেলুদা আমার আগেই উঠে যোগব্যায়াম সেরে স্নানে ঢুকেছিল, এইমাত্র বেরিয়ে এসে বলল, 'চটপট সেরে নে—অনেক কাজ।'

পনেরো মিনিটের মধ্যেই আমার সব কিছু সারা হয়ে গেল। ব্রেকফাস্ট খেতে যখন নীচে নেমেছি তখন সবে সাতটা বেজেছে। একটু অবাক লাাগিল দেখে যে নিশিকান্তবাবু আমাদের আগেই ডাইনিং রুমে এসে হাজির হয়েছেন। ফেলুদা বলল, 'আপনি তো খুব আর্লি রাইজার মশাই?'

কাছে গিয়ে বুঝলাম, মুখে সেই হাসিটা থাকা সত্ত্বেও ভদ্রলোককে কেমন জানি একটু নার্ভাস বলে মনে হচ্ছে।

'আপনাদের, ইয়ে, মানে ভাল ঘুমটুম হয়েছিল?'

বুঝলাম আসলে ওর অন্য কিছু বলার দরকার, আগে একটু পাঁয়তাড়া কষছেন। ভদ্রলোকের গলাটা শুকনো শোনাল।

'মন্দ কী?' ফেলুদা বলল। 'কেন বলুন তো?

ভদ্রলোক এ দিক ও দিক দেখে নিয়ে তার কোটের বুক পকেট থেকে একটা হলদেটে কাগজ বার করে ফেলুদার দিকে এগিয়ে দিলেন।

‘এটা কী ব্যাপার বলুন তো?’

দেখি কাগজটার উপর কালো কালি দিয়ে কয়েকটা অদ্ভুত অক্ষরে কী যেন লেখা রয়েছে!

ফেলুদা বলল, ‘এ তো তিব্বতি লেখা বলে মনে হচ্ছে। কোথায় পেলেন?

‘কাল রাত্রে-মানে মাঝরাত্রী-অ্যাট, মানে অ্যাট ডেড অফ নাইট–কেউ আমার ঘরে ফেলে দিয়ে গেছে।’

‘বলেন কী!’

আমার কিন্তু কথাটা শুনেই বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল। নিশিকান্তবাবুর ঘর হল আমাদের পাশের ঘর; ওটাও হোটেলের পিছন দিকে। আমাদের আর ওর ঘরের জানালার বাইরে দিয়ে একই বারান্দা গেছে, আর সেই বারান্দায় ওঠার জন্য কাঠের সিঁড়ি রয়েছে।

‘এটা রাখতে পারি?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘স্বছ্–মানে স্বচ্ছন্দে। কিন্তু কী লিখেছে, সেটার একটা ইয়ে না করা অবধি...’

‘সেটা আর এমন কী কঠিন। তিব্বতি ভাষা-জানা লোকের তো অভাব নেই এখানে। আর কিছু না হোক–টিবেটান ইনস্টিটিউট তো আছে।’

‘হ্যাঁ। সেই আর কী।’

‘তবে আর কী। আপনি চিন্তা করছেন কেন? এটা হুমকি বা শাসনি গোছের একটা কিছু, সেটা ভাবার তো কোনও কারণ নেই। নাকি আছে?’

নিশিকান্তবাবু চমকে উঠে। তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বললেন, ‘সার্টেনলি নট!’

‘এমনও তো হতে পারে যে এটায় বলা হয়েছে-তোমার মঙ্গল হোক বা তুমি দীর্ঘজীবী হও।’

‘তা তো বটেই। অবিশ্যি, মানে হঠাৎ, কথা নেই বাতা নেই, আশীর্বাদটাই বা করবে কেন– হেঁ হেঁ।’

‘হুমকিরও কোনও কারণ নেই বলছেন?’

‘না না। আমি মশাই যাকে বলে নট ইন সেভেন, নট ইন ফাইভ।’

ফেলুদা বেয়ারাকে চা আর ডিমা-রুটি অডার দিয়ে বলল, ‘যাক গে–এ নিয়ে আর ভাববেন না। আমরা তো পাশের ঘরেই রয়েছি। আপনার কোনও চিন্তা নেই৷’

‘বলছেন?’ আজ সকালে এই প্রথম ভদ্রলোকের অনেকগুলো দাঁত এক সঙ্গে দেখা গেল।

‘আলবৎ। চা খেয়েছেন?’

‘এবার খাব আর কী৷’

‘পেট ভরে ব্রেকফাস্ট করুন। রোদ উঠেছে। দুপুরে লামা-নাচ দেখার প্রোগ্রাম আছে। কুছ পরোয় নেহি।’

‘আপনাকে যে কী বলে থ্যা–‘

‘থ্যাঙ্কস দিতে হবে না। আপনার চেকটি যেন খোয়া না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখবেন।’

জিপি ঠিক সময়ই হাজির হল। আমরা উঠতে যাব, এমন সময় দেখি আরেকটা জিপ বাংলোর দিক থেকে আসছে। নম্বরটা দেখে কেমন জানি চেনা মনে হল। SKM 463, ওহো–এই নম্বরের গাড়িই তো সেই নেপালি ড্রাইভার চালাচ্ছে, যে অ্যাক্সিডেন্ট থেকে

পার পেয়েছিল। এবার নীল কোট পরা ড্রাইভারকে দেখতে পেলাম, আর তার পাশেই বসে–ওমা, এ যে শশধরবাবু।

ভদ্রলোক আমাদের দেখে গাড়ি থামিয়ে বললেন, 'আমির কাছ থেকে খবরের জন্য ওয়েট করছিল। বৃষ্টির বহর দেখে ভয় হচ্ছিল রাস্তা বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে।'

'নাঃ। অবিশ্যি নেহাত বেগতিক দেখলে ঠিক করেছিলাম। ভায়া কালিম্পং চলে যাব।'

'ওই ড্রাইভারই তো শেলভাঙ্কারের গাড়ি চালাচ্ছিল–তাই না?'

শশধরুবাবু হেসে উঠলেন।'আপনি তো তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন দেখছি। ইয়েস-ইউ আর রাইট। আমি ওকে ডেলিবারেটলি বেছে নিয়েছি। প্রথমত, গাড়িটা নতুন; দ্বিতীয়ত-বাজ কখনও একই জায়গায় দুবার পড়ে না, জানেন তো?'

শশধরবাবু দ্বিতীয়বার গুডবাই করে বাজারের রাস্তা দিয়ে নীচের দিকে চলে গেলেন। আমরা আমাদের জিপে উঠলাম। ড্রাইভারকে বলাই ছিল কোথায় যাবে, তাই আর বৃথা বাক্যব্যয় না করে রওনা দিয়ে দিলাম।

ডাকবাংলোর কাছাকাছি গিয়ে একবার উপরের দিকে চেয়ে দেখলাম হেলমুটকে দেখা যায় কি না। কাউকেই দেখতে পেলাম না। কাল কুয়াশায় কিছু দেখা যাচ্ছিল না, আর আজ আকাশে এক টুকরো মেঘও নেই। বাঁ দিকে শহর অনেক দূর পর্যন্ত নীচে নেমে গেছে। একটা বাড়ি দেখে ইস্কুল বলে মনে হল, কারণ তার সামনেই একটা চারকোেনা খোলা জায়গা, আর তার দুদিকে দুটো খুদে খুদে সাদা গোলপোস্ট। এখনও ইস্কুলের সময় হয়নি, না হলে ইউনিফর্ম পরা খুদে খুদে ছেলেদেরও দেখা যেত।

আরও কিছু দূর গিয়ে একটা চৌমাথা পড়ল। ডান দিকে একটা পান-সিগারেটের দোকান, মাঝখানে পুলিশ, বা দিকে একটা রাস্তা পিছনে নীচের দিকে চলে গেছে। সামনের দিকে রাস্তাটা দু ভাগ হয়ে গেছে। একটার মুখে একটা গোট–তাতে লেখা ইন্ডিয়া হাউস-সেটা

পাহাড় বেয়ে উপর দিকে উঠে গেছে। আমরা নিলাম অন্য রাস্তাটা, যেটা সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গেছে।

মিনিট খানেক চলার পরেই রাস্তার ডান পাশে পাহাড়ের গায়ে পাথরের ফলকে খোদাই করে বড় বড় অক্ষরে লেখা দেখলাম–নর্থ সিকিম হাইওয়ে।

ফেলুদা একটা অচেনা গান গুনগুন করে গাইছিল, সেটা থামিয়ে ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, 'ইয়ে রাস্তা কিতনা দূর তক গিয়া?'

ড্রাইভার বলল রাস্তা গেছে চুংথাম পর্যন্ত। সেখানে আবার দুটো রাস্তা আছে, যার একটা গেছে। লাচেন, আরেকটা লিচুং।। দুটোরই নাম শুনেছি, দুটোরই হাইট না হাজার ফুটের কাছাকাছি, আর দুটোই নাকি অদ্ভুত সুন্দর জায়গা।

'রাস্ত ভাল?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'তা ভাল, তবে পানি হোনেসে কভি কভি বিগড় যাতা।'

'ল্যান্ডস্লাইড হয়?'

'হাঁ বাবু। রাস্তা তোড় যাতা, বিরিজ তোড় যাতা, ট্রাফিক সব বন্ধ হো যাতা'

শহর ছাড়তে বেশি সময় লাগল না। একটা আমি ক্যাম্প পেরোতেই একেবারে নিরিবিলি জায়গায় এসে পড়লাম! এখন নীচের দিকে তাকালে পাকা বাড়ির বদলে ফসলের খেত দেখা যাচ্ছে। এখন ভুট্টা হয়েছে, ধানের সময় ধান হয়। পাহাড়ের গা কেটে সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে করা খেত–ভারী সুন্দর দেখতে।

মাঝে মাঝে রাস্তার ধারে মাইল পোস্ট পড়ছে, তবে তাতে সব কিলোমিটারে লেখা। প্রথম প্রথম অসুবিধে হচ্ছিল, তারপর মনে মনে হিসেব (৫ মাইল = ৮ কিলোমিটার) করে নেওয়ার অভ্যাস হয়ে গেল।

দশ কিলোমিটার ছাড়িয়ে কিছু দূরে গিয়ে এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার বলল, এই হচ্ছে অ্যাক্সিডেন্টের জায়গা।

আমরা গাড়ি থেকে নামলাম। এতক্ষণ গাড়ির শব্দে যেটা বুঝতে পারিনি, সেটা এবার বুঝতে পারলাম।

রাস্তা থেকে অনেকখানি নীচে খাদের মধ্যে দিয়ে নদী বয়ে চলেছে, তার একটা সর সর শব্দ আছে, আর আছে মাঝে মাঝে কে জানে কদুর থেকে ভেসে আসা নাম-না-জানা পাহাড়ে পাখির শিস। এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

আমরা যেদিকে যাচ্ছিলাম, সেদিকে মুখ করে দাঁড়ালে বাঁ দিক দিয়ে নেমেছে ঢাল, আর ডান দিক দিয়ে পাহাড় খাড়াই উপরে উঠে গেছে। এই পাহাড়ের গা দিয়েই পাথর গড়িয়ে পড়ে অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছিল। সেই পাথরকে ভেঙে টুকরো করে এখন রাস্তার ধারে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে। সেগুলোকে দেখে আর অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা ভেবে পেটের ভিতরটা কেমন জানি করে উঠল।

ফেলুদা প্রথমে চটপট কয়েকটা ছবি তুলে নিল, তারপর রাস্তার বাঁ পাশটায় গিয়ে নীচের দিকে দেখে কয়েকবার খালি ইহুঁ বলল। তারপর ক্যামেরাটা কাঁধ থেকে খুলে আমার হাতে দিয়ে বলল, ‘এই ঢাল দিয়ে হ্যাঁচোড় পাঁচোড় করে কিছুদূর নেমে যাওয়া বোধহয় খুব কঠিন হবে না। তুই এখানেই থাক। আমার মিনিট পনেরোর মামলা।’

আমি যে উত্তরে কিছু বলব, ওকে বাধা দেবার কোনও চেষ্টা করব, তার আর সুযোগই হল না; ও চোখের নিমেষে। এবড়ো-খেবড়ো পাথর আর গাছগাছড়া লতাপাত খামচাতে খামচাতে তা্িরতরিয়ে নীচের দিকে নেমে গেল। আমার কাছে কাজটা বেশ দুঃসাহসিক বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু ফেলুদা দেখি তারই মধ্যে শিস দিয়ে চলেছে।

ক্রমে ফেলুদার শিস মিলিয়ে গেল। আমি ভরসা করে নীচের দিকে চাইতে পারছিলাম না, কিন্তু এবার একবার না দেখলেই নয় মনে করে রাস্তার কিনারে গিয়ে মাথাটা বাড়িয়ে

দিলাম। যা দেখলাম তাতে বুকটা কেঁপে উঠল। ফেলুদা পুতুল হয়ে গেছে; না জানলে তাকে দেখে চিনতেই পারতাম না।

ড্রাইভার বলল, 'বাবু ঠিক জায়গাতেই পৌঁছেছেন। ওইখানেই গিয়ে পড়েছিল। জিপটা।' ফেলুদার আন্দাজ অব্যর্থ। ঠিক পনেরো মিনিট পরে খচমচ খড়মড় শব্দ শুনে আবার এগিয়ে গিয়ে দেখি ফেলুদা যেভাবে নেমেছিল সেইভাবেই আবার এটা-ওটা খামচে ধরে উঠে আসছে। হাতটা বাড়িয়ে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে রাস্তায় তুলেই জিজ্ঞেস করলাম—'কী পেলে?'

'গাড়ির কিছু ভাঙা পার্টস, নাট-বোল্ট, কিছু ভাঙা কাচ, একটা তেলচিটে ন্যাকড়া। নো যমন্তক।'

মূর্তিটা যে পাবে না সেটা আমারও মনে হয়েছিল।

'আর কিছু না?'

ফেলুদা তার প্যান্ট আর কোটটা ঝেড়ে নিয়ে পকেট থেকে একটা ছোট্ট জিনিস বার করে আমাকে দেখাল। সেটা আর কিছুই না—একটা ঝিনুকের কিংবা প্লাস্টিকের তৈরি সাদা বোতাম-মনে হয় শার্টের। আমাকে দেখিয়েই বোতামটা আবার পকেটে রেখে ফেলুদা উলটোদিকে খাড়াই পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেল।'পাথর...পাথর...পাথর' আপন মনে বিড়বিড় করে চলেছে সে। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'আরেকটু তেনজিঙ্গি না করলে চলছে না। '

এবারে আর ফেলুদাকে একা ছাড়লাম না, কারণ খাড়াই খুব বেশি না, আর মাঝে মাঝে এমন এক-একটা জায়গা আছে যেখানে ইচ্ছে করলে একটু জিরিয়ে নেওয়া যায়। ফেলুদা আগেই বলে নিয়েছিল—তুই আগে ওঠ, তোর পিছনে আমি। তার মানে হচ্ছে। আমি যদি পা হড়কে পড়ি, তা হলে ও আমাকে ধরবে।

খানিক দূরে ওঠার পরেই ফেলুদা হঠাৎ পিছন থেকে বলল—'থাম।'

একটা খোলা সমতল জায়গায় এসে পড়েছি। সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা ঝেড়ে চারদিকটা একবার দেখলাম। ফেলুদা আবার গুনগুন গান ধরেছে, আর দৃষ্টি মাটির দিকে রেখে পায়চারি করছে।

'হুঁ!'

শব্দটা এল প্রায় মিনিট খানেক পায়চারির পর। ফ্ল্যাট জায়গাটা যেখানে ঢালু হয়ে নীচে নেমেছে, তারই একটা অংশের দিকে ফেলুদা একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। আশেপাশে ঘাস

থাকলেও এই বিশেষ অংশটা নেড়া। মাটি আর দু-একটা নুড়ি পাথর ছাড়া আর কিছু নেই।

'এখান থেকেই পাথরবাবাজি গড়িয়েছেন। লক্ষ করে দাখ—এইখান থেকে শুরু করে ঢাল বেয়ে গাছপালা ভেঙে চলেছে নীচে অবধি। ও ঝোপড়াটা দ্যাখ-ওই ফার্নের গোছাটা দ্যাখ—কীভাবে থেতলেছে। এগুলো সব পরিষ্কার ইনডিকেশন।'

আমি বললাম, 'কত বড় পাথর বলে মনে হচ্ছে?'

ফেলুদা বলল, 'নীচে তো টুকরোগুলো দেখলি। কত বড় আর হবে? আর এ হাইট থেকে গড়িয়ে পড়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা সৃষ্টি করার জন্য একটা ছোটখাটো ধোপার পুঁটুলির সাইজের পাথরই যথেষ্ট।'

'তাই বুঝি?'

'তা ছাড়া আর কী? এ হল মোমেন্টামের ব্যাপার। ম্যাস ইনটু ভেলোসিটি। ধর, তুই যদি মনুমেন্টের তলায় দাঁড়িয়ে থাকিস, আর মনুমেন্টের উপর থেকে কেউ যদি তাগ করে একটা পায়রার ডিমের সাইজের নুড়িপাথরও তোর মাথায় ফেলে, তা হলে তার চোটেই তোর মাথা ফুটি-ফাটা হয়ে যাবে। একটা ক্রিকেট বল যত বেশি হাইটে ছোড়া যায়,

সেটাকে লুফতে তত বেশি চোট লাগে হাতে। লোফার সময় কায়দা করে হাতে টেনে নিতে না পারলে অনেক সময় তেলো ফেটে যায়। অথচ বল তো সেই একই থাকছে, বদলাচ্ছে কেবল হাইট, আর তার ফলে মোমেন্টাম।'

ফেলুদা এবার নেড়া জায়গাটোর পাশে ঘাসের উপর বসে পড়ে বলল, 'পাথরটা কীভাবে পড়েছিল জানিস?'

'কীভাবে?' আমি ফেলুদার দিকে এগিয়ে গেলাম।

'এই দ্যাখ।'

ফেলুদা নেড়া অংশটার একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখাল। আমি ঝুকে পড়ে দেখলাম সেখানে একটা ছোট্ট গর্ত রয়েছে। সাপের গর্ত নাকি?

'যদ্দূর মনে হয়, ফেলুদা বলে চলল, 'প্রায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট সিওর হয়ে বলা চলে যে একটা লম্বা লোহার ডান্ডা বা ওই জাতীয় একটা কিছু মাটিতে ঢুকিয়ে চাড় দিয়ে পাথরটাকে ফেলা হয়েছিল। তা না হলে এখানে এ রকম একটা গর্ত থাকার কোনও মানে হয় না। অর্থাৎ–'

অর্থাৎ যে কী আমিও বুঝে নিয়েছিলাম। তবুও মুখে কিছু না বলে আমি ফেলুদাকে কথাটা শেষ করতে দিলাম।

'অর্থাৎ মিস্টার শিবকুমার শেলভাঙ্কারের অ্যাক্সিডেন্টটা প্রকৃতির নয়, মানুষের কীর্তি। অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রুর ও শয়তানি পদ্ধতিতে কেহ বা কাহারা তাহাকে হত্যা করিয়াছিল। অর্থাৎ- এক কথায়-গণ্ডগোল, বিস্তর গণ্ডগোল...'

৫. খুনের জায়গা

খুনের জায়গা (এখন থেকে আর অ্যাক্সিডেন্ট বলব না) থেকে হোটেলে ফিরে আমাকে নামিয়ে দিয়ে ফেলুদা বলল ওর একটু কাজ আছে–একটু পরে ফিরবে। আমি জানি যে যদি জিজ্ঞেস করি কী কাজ তা হলে উত্তর পাব না।

আমরা ফেরার পথে চৌমাথায় হেলমুটের সঙ্গে দেখা হয়েছিল; তাকে রুমটেকের নাচের কথা বলতে সেও যেতে চাইল। আর যাবেন নিশিকান্তবাবু। কোথায় গেলেন ভদ্রলোক? আর তার সেই হিজিবিজি তিব্বতি লেখার মানে করারই বা কী হ' ল?

একবার মনে হল ফেলুদা না আসা পর্যন্ত বাজারের রাস্তায় পায়চারি করে কাটিয়ে দিই। তারপর মনে হল–নাঃ, হোটেলেই যাই। সঙ্গে একটা গল্পের বই এনেছি, ঘরে বসে সেটা পড়তে পড়তেই ফেলুদা এসে যাবে।

হোটেলে ঢুকতেই দেখলাম নিশিকাস্তবাবু গোমড়া মুখ করে ডাইনিং রুমে বসে আছেন। অবিশ্যি আমাকে দেখেই তাঁর সে পুরনো হাসি ফিরে এল। বললেন, ‘দাদা কই?’ বললাম, ‘ একটু কাজে বেরিয়েছেন; আসবেন এক্ষুনি।’

‘তোমার দাদার গায়ে খুব জোর, তাই না?’

এ আবার কী রকম প্রশ্ন করেন। ভদ্রলোক? আমি কিছু বলার আগেই আবার বললেন, ‘উনি ভরসা দিচ্ছেন বলেই রয়ে গেলুম; তা না হলে আজই পাততাড়ি গুটিয়ে দার্জিলিং পালাতুম?’

‘কেন?’

ভদ্রলোক হাত কচলাতে শুরু করেছেন। বুঝলাম তাঁর নার্ভাসনেসটা আবার ফিরে এসেছে।

ভদ্রলোক এ দিক ও দিক দেখে আবার পকেট থেকে সেই কাগজটা বার করলেন। ‘জানি ভাই–সাতজন্মে কারুর কোনও অনিষ্ট করিনি, অথচ এ রকম শাসনি শেষটায় আমাকেই দিলে!’

‘ওটার মানে বের করেছেন নাকি?’

ভদ্রলোক বললেন, ‘ একটা অ্যাং-মানে অ্যাংজাইটি ছিল, তাই সোজা চলে গেলুম তিব্বত ইনস্টিটিউটে। কাগজটা দেখালুম। কী বললে জান? বললে এ লেখাটার মানে হচ্ছে ‘মৃত্যু। গিয়াংফুং-না। ওই জাতীয় একটা কী তিব্বতি কথা। মানে হচ্ছে ডেথ। থার্টি সেভেনে আমার একটা ফাঁড়া আছে তাও জানি।’

আমার একটু বিরক্ত লাগল। বললাম, ‘শুধু তো বলেছে মৃত্যু। এমন তো বলেনি যে আপনাকেই মরতে হবে।’

ভদ্রলোক হঠাৎ যেন একটু আশার আলো দেখতে পেলেন।

‘তাও বটে। মৃত্যু মানে তো এনিবডিজ ডেথ হতে পারে।–তাই না?’

‘কাগজে লেখা আছে বলেই যে কাউকে মরতেই হবে তারই বা কী মানে আছে?’

কিন্তু তাও যেন ভদ্রলোক ভরসা পেলেন না! আবার তাঁর মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। তারপর ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ ভেবে প্রায় নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললেন, ‘দক্ষিণের জানালাটা খোলা ছিল.ঝড় বৃষ্টি হচ্ছিল, তার মানে হাওয়া ছিল...বাইরের জিনিস হাওয়ার সঙ্গে ঘরের ভিতর এসে পড়তে পারে। এটা যদি এমনি উট্‌কো কাগজের টুকরো হয়...হয়তো ছেড়া পুঁথিটুথির পাতা–কাছাকাছি তো ছোটখাটো গুম্‌ফাও রয়েছে...একটা তো শহরে ঢোকার মুখটাতেই...হুঁ...হুঁ...’

আমি আর কাল রাত্রে জানালা দিয়ে কী দেখেছি সেটা বললাম না। তা হলে যেটুকু ভরসা পাচ্ছেন ভদ্রলোক, তাও আর পেতেন না। শেষে যেন আর ভাবতে না পেরেই ভদ্রলোক জোর করে তাঁর মন থেকে দুশ্চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, ‘যাকগে! তোমার দাদাই তো রয়েছেন। বেশ কনফিডেন্স পাওয়া যায়। ভদ্রলোককে দেখে। খেলোয়াড়-টেলোয়াড় ছিলেন নাকি? না, এক্সারসাইজ করেন?’

‘এককালে ক্রিকেট খেলেছেন। এখন যোগব্যায়াম করেন৷’

‘ঠিক ধরেচি। আজকালকার বাঙালিদের মধ্যে আমন ফিট বডি চোখে পড়ে না। চা খাবে?’

পাহাড়ে ওঠানামা করতে বেশ পরিশ্রম হয়েছিল, তাই বললাম চায়ে আপত্তি নেই।

ভদ্রলোক বেয়ারাকে ডেকে দু কাপ চা অর্ডার দিলেন। চা এসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই ফেলুদা ফিরে এল। আসার দশ সেকেন্ডের মধ্যেই নিশিকান্তবাবু তাঁর ‘মৃত্যু’-র কথাটা ফেলুদাকে বলে দিলেন।

ফেলুদা আরেকবার কাগজটা দেখে বলল, ‘আপনাকে এতটা ইম্পার্ট্যান্স দিচ্ছে কেন সেটা আঁচ করতে পারছেন?’

নিশিকান্তবাবু মাথা নাড়লেন, ‘আমি স্যার আকাশ-পাতাল ভেবেও এর কুল-কিনারা করতে পারছি না।’

ফেলুদা বলল, ‘আর ভাববেন না। কারণ না থাকলে কেউ কারুর মৃত্যু কামনা করে না। আমার বিশ্বাস ওটা যে-ই ফেলে থাকুক না কেন, ঝড়ের রাতে অন্ধকারে ভুল করে ভুল ঘরে ফেলেছে। তিব্বতি তিব্বতিকেই তিব্বতি ভাষায় শাসায়। আপনাকে শাসতে হলে যে ভাষা আপনি জানেন তাতেই শাসানো স্বাভাবিক। নইলে তো শাসনি মাঠে মারা—তাই নয় কি?’

'তা তো বটেই।'

'ব্যস-নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'আর গোলমাল হলে আপনি তো আছেনই।'

'আমি থাকলে কিন্তু গোলমালটা মাঝে-মধ্যে একটু বেশিই হয়।'

'তাই বুঝি?'

ভদ্রলোকের মুখ আবার ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

ফেলুদা আর কোনওরকম সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা না করে দোতলায় নিজের ঘরে চলে গেল। আমি জানি কাঁদুনে ভিতু লোকদের ফেলুদা বরদাস্ত করতে পারে না। নিশিকান্তবাবু যদি ওর সিমপ্যাথি পেতে চান, তা হলে ওঁকে কাঁদুনি বন্ধ করতে হবে।

আমি চা শেষ করে ঘরে গিয়ে দেখি ফেলুদা আবার তার নীল খাতার উপর ঝুঁকে পড়েছে। আমি ঢুকতেই বলল, 'টেলিগ্রাফ অফিসগুলোতে বেশির ভাগ লোকই যে অশিক্ষিত সেটা আগেই জানা ছিল—তবে এটা একটু বেশি রকম বাড়াবাড়ি।'

'হঠাৎ টেলিগ্রাফ আপিসে কেন?'

'শশধরবাবুকে একটা কেব্‌ল করে দিলাম। ও পৌঁছবার আগেই অবিশ্যি পৌঁছে যাবে-তাও দেরি করে কোনও লাভ নেই।'

'কী লিখলে?'

'হ্যাভ্ রিজন টু সাসপেক্ট শেলভাঙ্কারস ডেথ নট অ্যাক্সিডেন্টাল। অ্যাম ইনভেসটিগেটিং।'

'বাড়াবাড়িটা কীসে দেখলে।'

'ও! সে অন্য ব্যাপার।'

ফেলুদা নাকি টেলিগ্রাফ আপিসে কেরানিদের ঘুষ দিয়ে গত ক' দিনে শেলভাঙ্কারের নামে কোনও টেলিগ্রাম এসেছিল কি না সেটা জেনে নিয়েছে। একটা ছিল শশধর বাবুর টেলিগ্রাম–'অ্যাম অ্যারাইভিং ফোর্টিন্‌থ।'

'আর অন্যটা?'

'পড়ে দ্যাখ'–বলে ফেলুদা তার নীল খাতাটা আমার দিকে এগিয়ে দিল। দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে

YOUR SON MAYBE IS A SICK MONSTER...PRITEX.

পড়ে তো চক্ষু চড়কগাছ। সিক্‌ মনস্টার? রুগ্‌ণ রাক্ষস? সে আবার কী?

ফেলুদা বলল, 'বোঝাই যাচ্ছে যে কোনও গোলমাল করেছে। কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে–কী গোলমাল। আসল টেলিগ্রামটা কী ছিল।'

ফেলুদা বলল, 'ওটা বোধহয় ছাপার ভুল নয়। মনে হয়, ওটা কোনও গোয়েন্দা এজেন্সির টেলিগ্রাফিক অ্যাড্রেস। PRI অর্থাৎ প্রাইভেট, আর TEX হল TEC-এর বহুবচন। TEC মানে যে ডিটেকটিভ সেটা নিশ্চয়ই তোকে বলে দিতে হবে না।'

'এই টেলিগ্রামটা পেয়েই কি শেলভাঙ্কার ঘাবড়ে গিয়েছিল?'

'কিছুই আশ্চর্য না।'

'আর তার মানে এই এজেন্সিটা শেলভঙ্কারের ছেলের খোঁজ করছিল?'

'তই তো মনে হয়। কিন্তু Sick Monste! হরি হরি!'

আমি বললাম, 'কতগুলো রহস্য এক সঙ্গে সমাধান করবে বলো তো।'

ফেলুদা বলল, ‘সেইটেই তো ভাবছি। প্রশ্নের পর প্রশ্ন। এইবেলা খাতায় নোট করে ফেলা উচিত। বল তো দেখি একটা একটা করে।’

‘ এক– Sick Monster l’

‘তারপর?

‘পাথর কে ফেলল?’

‘গুড।‘

‘তিন–মূর্তিটা কোথায় গেল।’

‘ঠিক হ্যায়।’

‘চার–নিশিকান্তবাবুর ঘরে কাগজ কে ফেলল।’

‘আর, কেন ফেলল। বহুত আচ্ছা।’

‘পাঁচ–খুনের জায়গায় কার বোতাম।’

‘অবিশ্যি সেটা শেলভাঙ্কারের নিজের শার্টের বোতামও হতে পারে। যাই হোক-বলে চল।’

‘ছয়–তিব্বতি ইনস্টিটিউটে গিয়ে, কে মূর্তির কথা জিজ্ঞেস করেছিল।’

‘স্প্লেনডিড। আর বছর দশেকের মধ্যেই তুই গোয়েন্দাগিরি শুরু করতে পারবি।’

ফেলুদা ঠাট্টা করলেও বুঝতে পারলাম যে আমি পরীক্ষায় পাশ করেছি।

‘শুধু একটি লোকের সঙ্গে এখন দেখা হওয়া দরকার। মনে হয় তিনি শেলভঙ্কার সম্বন্ধে জরুরি ইনফরমেশন দিতে পারেন।’

‘কে লোকটা?’

‘ডক্টর বৈদ্য। যিনি ভবিষ্যৎ বলেন, আর প্রেতাত্মার সঙ্গে যোগ স্থাপন করেন, আর অন্যান্য যাবতীয় ভেলকি প্রদর্শন করেন। শুনেটুনে লোকটাকে ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে।‘

৬. রুমটেক যেতে হলে

রুমটেক যেতে হলে যে পথে শিলিগুড়ি থেকে গ্যাংটক আসে, সে পথে খানিক দূর ফিরে গিয়ে তারপর ডান দিকে একটা মোড় নিয়ে নতুন পথে সটান সিধে রাস্তায় চলতে হয়। রুমটেকের হাইট গ্যাংটকের চেয়েও প্রায় এক হাজার ফুট বেশি, কিন্তু যাবার রাস্ত প্রথমে উতরাই নেমে একেবারে নদী পর্যন্ত গিয়ে একটা ব্রিজ পেরিয়ে উলটোদিকের পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই ওঠে। ছোট ছোট গ্রামের বাড়ি আর ভুট্টার খেতের পাশ দিয়ে রাস্তা এঁকেবেঁকে চলে–চারিদিকের দৃশ্য দার্জিলিং-এর চেয়ে কোনও অংশে কম সুন্দর নয়।

সকালের রোদ এখন আর নেই। হোটেলে থাকতেই মেঘ উঠে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। তাতে অবিশ্যি এক হিসেবে ভালই, কারণ গরমের কোনও সম্ভাবনা নেই। কিছুদিন আগের দুর্ঘটনার জন্যেই বোধহয়, আমাদের ড্রাইভার খুব সাবধানে জিপ চালাচ্ছিল। সামনের সিটে ড্রাইভারের পাশে বসেছি আমি আর ফেলুদা। পিছনের দুটো সিটে মুখোমুখি বসে আছে হেলমুট উঙ্গার আর নিশিকান্ত সরকার। হেলমুটের পায়ের ব্যথাটা নাকি সেরে গেছে। ওর কাছে নাকি কী জার্মান মলম ছিল, তাতেই কাজ দিয়েছে। নিশিকান্তবাবুর ভয়ের ভাবটা বোধহয় কেটে গেছে, কারণ এখন উনি গুনগুন করে হিন্দি ফিল্মের গানের সুর ভাঁজছেন। গ্যাংটক শহর এখন আমাদের উলটোদিকের পাহাড়ের গায়ে বিছিয়ে আছে। মনে হয় শহরটাকে আর খুব বেশিক্ষণ দেখা যাবে না, কারণ নীচের উপত্যকা থেকে কুয়াশা উঠতে শুরু করেছে উপরের দিকে।

ফেলুদা এখন পর্যন্ত একটাও কথা বলেনি। সেটা আশ্চর্য না। আমি জানি ওর মাথার ভিতর এখন সেই ছটা প্রশ্নের উত্তর বার করার প্রচণ্ড চেষ্টা চলেছে। নেহাত কাল কথা দিয়ে ফেলেছিল। তাই, তা না হলে ও এখন হোটেলের ঘরে বসে নীল খাতায় হিজিবিজি লিখত আর হিসেব করত।

বাইরের ঠাণ্ডা থেকে বেশ বুঝতে পারছি যে আমরা এখন বেশ হাইটে উঠে গেছি। সামনে একটা মোড়। ড্রাইভার জিপে হর্ন দিতে দিতে সেটা ঘুরতেই দেখলাম সামনে রাস্তার দু। ধারে ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে বাঁশের এক খুঁটির সঙ্গে আরেক খুঁটিতে বাঁধা দড়িতে টাঙানো সারি সারি রং-বেরঙের চারকোনা নিশান। এই নিশানগুলো টাঙিয়ে দিয়ে তিব্বতিরা নাকি অনিষ্টকারী প্রেতাত্মাদের দূরে সরিয়ে রাখে। কাছ থেকে দেখলে বোঝা যায় প্রত্যেকটা নিশানে নকশা করা আছে।

একটা ক্ষীণ শব্দ অনেকক্ষণ থেকেই কানে আসছিল। এবার সেটা ক্রমশ জোর হতে আরম্ভ করল। ভোঁ ভোঁ ভোঁ ভোঁ গুরুগম্ভীর শিঙার শব্দ, আর তার সঙ্গে থেকে থেকে ঝম ঝম্ করে কাঁসা বা পিতলের ঝাঁঝের আওয়াজ, আর চড়া বেসুরো সানাইয়ের মতো অ্যাওয়াজ! এটাই বোধহয় তিব্বতি নাচের বাজনা।

রাস্তাটা গিয়ে এক জায়গায় থেমে গেছে। তারপরে রয়েছে একটা বড় গ্যারাজ গোছের ঘর, যাতে কয়েকটা জিপ রয়েছে, আর বাঁ দিকে রয়েছে কিছু দা োকান; রাস্তার দু ধারেও কয়েকটা জিপ আর স্টেশন ওয়াগন দাঁড়িয়ে আছে, আর চারিদিকে ঘোরাফেরা করছে নানান রঙের পোশাক পরা ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়ির দল।

আমাদের জিপটা রাস্তার ডান দিকে একটা প্রকাণ্ড গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বুঝলাম এটাই রুমটেক মঠের ফটক। নিশিকান্তবাবু বোধহয় হেলমুটের খাতিরেই ইংরেজিতে বললেন, ‘দ্য লামাজ আর ড্যা-মানে ড্যানসিং।’ আমরা চারজনে গাড়ি থেকে নামালাম।

গেটের ভিতর ঢুকে দেখি সামনে একটা বিরাট খোলা উঠোন। সেটাকে একটা প্রকাণ্ড সাদা চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা হয়েছে; তাতে আবার গাঢ় নীল রঙের নকশা করা। এত সুন্দর চাঁদোয়া আমি কক্ষনও দেখিনি। চাঁদোয়ার নীচে উঠোনের মেঝেতে লোকেরা সব ভিড় করে। বাবু হয়ে বসেছে, আর পিছন দিকে একটা প্রকাণ্ড নকশা করা পদার সামনে আট-দশ জন লোক ঝলমলে পোশাক আর বীভৎস সব মুখোশ পরে ঘুরে ঘুরে দুলে দুলে নাচছে। বাজিয়ের দল লাল পোশাক পরে বসেছে নাচিয়েদের ডান দিকে। শিঙাগুলোতে

সবচেয়ে গভীর আওয়াজ হচ্ছে। সেগুলো প্রায় পাঁচ-ছ হাত লম্বা। আর সেগুলো বাজাচ্ছে আট-দশ বছর বয়সের ছেলেরা। সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত থমথমে অথচ জমকালো ব্যাপার। এমন জিনিস এর আগে আমি কখনও দেখিওনি বা শুনিওনি।

হেলমুট উঠোনে পৌঁছানো মাত্র পটাপট ছবি তুলতে আরম্ভ করে দিল। আজ তার কাঁধে তিনটে ক্যামেরা। ব্যাগটাও সঙ্গে রয়েছে; তার মধ্যে আরও ক্যামেরা আছে কি না কে জানে!

নিশিকান্তবাবু বললেন, 'বসবেন নাকি?'

'আপনি কী করছেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'আমার তো জিনিস দেখা; কালিম্পঙে দেখেছি। আমি একটু পেছন দিকটায় গিয়ে মন্দিরটা দেখে আসছি। শুনিচি ভেতরে নাকি অদ্ভুত সব কারুকার্য রয়েছে।'

আমি আর ফেলুদা ভিড়ের মধ্যে জায়গা করে নিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম। ফেলুদা বলল, 'এ সব দেখে-শুনে বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি সে কথা ভুলে যেতে হয়। গত এক হাজার বছরে এ জিনিসের কোনও পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না।'

ফেলুদা বলল, 'এটা ঠিক গুম্‌ফা নয়। গুম্‌ফা হল গুহা। এটাকে বরং মঠ বা মন্দির বলা চলতে পারে। ওই যে উঠোনের দুপাশে একতলা ঘরের লাইন দেখছিস-ওখানে সব লামারা থাকে। আর লক্ষ কর কত বাচ্চা ছেলে রয়েছে। সব মাথা মুড়োনো, গায়ে তিব্বতি জেকবা। এদের এখন ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। বড় হলে সব লামাটামা হবে।'

'মঠ। আর মনাস্টেরি কি এক জিনিস?'

'হ্যাঁ, মঠ–'

এইটুকু বলেই ফেলুদা হঠাৎ থেমে গেল। তার দিকে চেয়ে দেখি তার চোখ দুটো কুঁচকে গেছে, তার মুখ হাঁ হয়ে গেছে। হঠাৎ কী মনে পড়ল ফেলুদার?

মিনিট খানেক চুপ করে মাথা নেড়ে নিজের ওপর একটা ধিক্কারের ভাব দেখিয়ে ফেলুদা বলল, ‘পাহাড়ে এলে কি তা হলে আমার বুদ্ধিটা স্লো হয়ে যায়? এই সহজ জিনিসটা বুঝতে পারিনি এতক্ষণ?’

‘কী জিনিস? জিজ্ঞেস করলাম।’কোনটা বুঝতে পারনি? ‘Sick Monster! Sick হল সিকিম, আর Monster হল মনাস্টেরি। থ্যাঙ্ক ইউ, তোপ্‌সে।’

সত্যিই তো! বুঝতে পারা উচিত ছিল।’তা হলে পুরো টেলিগ্রামটার কী মানে দাঁড়াচ্ছে?

ফেলুদা পকেট থেকে তার খাতাটা বার করে সেই পাতাটা খুলে ফের পড়ল

‘ YOUR SON MAYBE IS A SICK MONSTE—গোড়ার দিকটায় কোনও গোলমাল নেই। Is-টাকে In করে নে! তা হলে দাঁড়াচ্ছে–ইয়োর সান মে বি ইন এ সিকিম মনাস্টেরি। তোমার ছেলে হয়তো সিকিমের কোনও মঠে রয়েছে। ব্যস–পরিষ্কার ব্যাপার। ’

‘তার মানে শেলভাঙ্কারের যে-ছেলে চোদ্দ না পনেরো বছর আগে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল, সে এখন এখানে রয়েছে?’

‘প্রাইটেক্স তো তাই বলছে। এখন, প্রাইটেক্সের কেরামতির দৌড় যে কতখানি তা তো জানি না। তবে এটা ঠিক যে শেলভাঙ্কার যদি টেলিগ্রামের ভুল সত্ত্বেও তার মানেটা আঁচ করে থাকে, তা হলে তার মনে আশার সঞ্চার হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কারণ সে ছেলেকে ভালবাসত, অনেকদিন ধরে তার খোঁজ করেছে৷’

‘ও যেদিন একটা কোনও গুম্‌ফায় যাচ্ছিল, সেটাও হয়তো টেলিগ্রামটা পাবার পর ছেলের সন্ধানে।‘

'কোয়াইট পসিব্‌ল। আর ছেলে যদি সত্যি করে থেকেই থাকে এ তল্লাটে, তা হলে অবিশ্যি.... '

ফেলুদা আবার চুপ করে গেল। মনে পড়ল শশধরবাবু বলেছিলেন শেলভঙ্কারের ছেলে বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। তার মানে সে তার বাপের শত্রু।

' উইল...উইল...উইল', ফেলুদা আপন মনে বিড়বিড় করে যাচ্ছে।'শেলভাঙ্কার যদি উইলে তাঁর ছেলেকে সম্পত্তি দিয়ে গিয়ে থাকেন, তা হলে সে অনেক টাকা পাবে।'

ফেলুদা ভিড়ের মধ্যে থেকে উঠে পড়ল, আর সেই সঙ্গে আমিও। বেশ বুঝতে পারলাম টেলিগ্রামের মানে করতে পেরে ফেলুদা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। এদিকে ওদিকে দেখছে সে। ভিড়ের মধ্যে অ-তিব্বতি ভারতীয় চেহারা খুঁজছে কি?

আমরা দুজনেই ভিড়ের দিকে চোখ রেখে এগিয়ে চললাম। বাঁ দিকের একতলা বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে আমরা চললাম। মঠের বাড়িটার দিকে-যেদিকে এই কিছুক্ষণ আগেই নিশিকান্তবাবু গেছেন। পিছন দিকটায় ক্রমে ভিড় হালকা হয়ে এসেছে। দু-একজন ভীষণ বুড়ো লামাকে দেখলাম। ঘরের দরজায় চৌকাঠে বসে আপন মনে প্রেয়ার হুইল ঘুরিয়ে চলেছে, তাদের মুখের চামড়া এত কুঁচকোনো যে দেখলে মনে হয় অন্তত একশো বছর বয়স হবেই। এদের বেশির ভাগেরই গোঁফ-দাড়ি কামানো, কিন্তু এক-একজনের দেখলাম নাকের নীচে গোঁফ না থাকলেও, ঠোঁটের দুপাশে সরু ঝোলা গোঁফ রয়েছে– যেমন কোনও কোনও চিনেদের থাকে।

পর্দার পিছন দিক দিয়ে গিয়ে আমরা মনাস্টেরির দালানের বারান্দায় পৌঁছলাম। দেয়ালে বোধহয় বুদ্ধের জীবনী থেকেই নানারকম ঘটনার ছবি আঁকা রয়েছে। বারান্দার পিছনে অন্ধকার হলঘর রয়েছে, তার মধ্যে সারি সারি প্রদীপের আলো জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। একটা প্রকাণ্ড লাল কাঠের দরজা দিয়ে এই ঘরে ঢুকতে হয়।

আশেপাশে প্রহরী জাতীয় কেউ নেই দেখে আমরা দুজনে চৌকাঠ পেরিয়ে হলঘরে ঢুকলাম! স্যাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডা ঘর। অদ্ভুত একটা ধূপের গন্ধ ভরে রয়েছে তাতে। কিন্তু অন্ধকার হলে কী হবে–তার মধ্যেই চারদিকের রঙিন সাজসজ্জার ঝলসানি ফুটে বেরোচ্ছে-তিন-তলা উচু সিলিং থেকে ঝুলছে লম্বা লম্বা আশ্চর্য কাজ করা সব সিল্কের নিশান।। ঘরের দু দিকে রঙিন কাপড়ে ঢাকা লম্বা লম্বা বেঞ্চি পাতা রয়েছে, প্রকাণ্ড গোল ঢাকের মতো কয়েকটা জিনিস খুঁটিতে দাঁড় করানো রয়েছে। আর পিছন দিকের সবচেয়ে অন্ধকার অংশটায় লম্বা বেদিতে বসানো রয়েছে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব মূর্তি, তার কোনটা বুদ্ধ আর কোনটা বুদ্ধ না সেটা আমার পক্ষে বোঝা ভারী মুশকিল।

কাছে গিয়ে দেখলাম। এই সব বড় বড় মূর্তির পায়ের কাছে আরও অনেক ছোট ছোট মূর্তি রয়েছে, নানারকম ফুলদানিতে ফুল রয়েছে, আর ছোট ছোট পেতলের পিদিমে আগুন জ্বলছে।

এই সব জিনিস খুব মন দিয়ে দেখছি, এমন সময় হঠাৎ ফেলুদা আমার পিঠে হাত দিল। ঘুরে দেখি ও দরজার দিকে চেয়ে রয়েছে। এটা সামনের মেন গেট নয়, পাশের একটা ছোট দরজা।

'বাইরে আয়।'

দাঁতে দাঁত চেপে কথাটা বলে ফেলুদা দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল।

দরজা দিয়ে বেরিয়ে দেখি ডান দিকে ওপরে যাবার সিঁড়ি রয়েছে।

'কোন দিকে গেল লোকটা জানি না; তবে চান্স নেওয়া ছাড়া গতি নেই।'

'কোন লোকটা?' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'লাল পোশাক। দরজার বাইরে থেকে উঁকি দিচ্ছিল; আমি চাইতেই সটকাল।'

'মুখটা দেখনি?'

'আলো ছিল না।'

দোতলায় উঠে দেখি সামনে একটা ঘর রয়েছে, তার দরজা বন্ধ। এটাতেই কি সেই হাই পোজিশনের লামা থাকেন নাকি? বাঁ দিকে খোলা ছাত, এখানে-ওখানে নিশান ঝুলছে। একতলা থেকে নাচের বাজনার শব্দ আসছে-ভোঁ ভোঁ ভোঁ ক্যাং ঝ্যাং ক্যাং! এদের নাচ নাকি একবার শুরু হলে সাত ঘণ্টার আগে থামে না।

আমরা ছাত দিয়ে হেঁটে উলটোদিকের পাঁচিলের দিকে এগিয়ে গেলাম। পিছনে পাহাড়ের দৃশ্য আবছা কুয়াশায় ক্রমে ঢেকে আসছে। ডান দিকের মঠের পিছন দিয়ে খাড়াই পাহাড় উঠে গেছে, তার উপর দিকটায় দেখলাম এক জায়গায় অনেকগুলো বাঁশের খুঁটিতে একসঙ্গে অনেকগুলো ভূত-তাড়ানো নিশান আস্তে আস্তে কুয়াশার পিছনে লুকিয়ে যাচ্ছে।

'শেলভাঙ্কারের ছেলে যদি এখানে-' ফেলুদার কথা শেষ হল না। একটা বিকট চিৎকারে আমরা দুজনেই চমকে থ মেরে গেলাম।

'ওরে বাবা-ওঃ! হেলপ! হেলপ!'

এ যে নিশিকান্তবাবুর গলা।

আর কিছু ভাববার আগেই ফেলুদা দেখি দৌড় দিয়েছে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরে বেরিয়ে মঠের পিছন দিকের দরজা খুঁজে বার করতে সময় লাগল এক মিনিটেরও কম। দরজার বাইরে বেরিয়ে দেখি দশ হাতের মধ্যেই পাহাড় খাড়াই উঠে গেছে। হান্টিং বুট আজও পায়ে ছিল, তাই উঠতে কোনও অসুবিধা হল না। কোন দিকে যেতে হবে সেটা মোটামুটি আন্দাজ করতে পারছি, কারণ 'হেলপ, হেলপ' চিৎকারটা এখনও আমাদের হেলপ করছে।

খানিক দূর উঠে একটা ফ্ল্যাট জায়গা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে যেখানে পৌঁছোলাম, সেটা পাহাড়ের কিনারা। তারপরেই খাদ, তবে সে খাদ বেশি দূর নামেনি—বড় জোর একশো ফুট। আর তাও ধাপে ধাপে। এরই একটা ধাপে-বোধহয় দু হাতের বেশি চওড়া নয়—একটা গাছড়াকে আঁকড়ে ধরে ঠিকরে বেরিয়ে-আসা চোখ উপরের দিকে করে ঝুলে আছেন নিশিকান্ত সরকার। আমাদের দেখেই ভদ্রলোক দ্বিগুণ জোরে চিৎকার করে উঠলেন–মরে গেলুম। বাঁচান!

নিশিকান্তবাবুকে উদ্ধার করা ফেলুদার পক্ষে এমন কিছু একটা কঠিন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু মুশকিল হল এই যে, তাঁকে জাপটে ধরে টেনে তোলামাত্র ভদ্রলোক চোখ উলটে ভিরমি দিলেন। অবিশ্যি জিপে এনে চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতেই জ্ঞান ফিরে এল।

‘কী ব্যাপার বলুন তো—ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

নিশিকান্তবাবু কোঁকানির সুরে বললেন, ‘আরো মশাই, কী আর বলব—এই এতখানি পথ-একটু হালকা হবার দরকার পড়েছিল—তা ধর্মস্থান অ-মানস-মানে যাকে বলে মনাস্ট্রি—তাই ভাবলুম পেছন দিকটায় গিয়ে দেখি-ঝোপঝাড়ের তো অভাব নেই।-তা জায়গাও পেলুম সুটেবল-কিন্তু আমাকে যে আবার ফলো করেছে, তা কী করে জানব বলুন!’

‘পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারুল?’

‘সেন্ট পারসেন্ট। কী সাং—মানে সাংঘাতিক ব্যাপার বলুন তো! নেহাত হাতের কাছে একটা গাছ পেলুম বলে-নইলে তিব্বতি শাসনি তো, মানে, অক্ষরে অক্ষরে–‘

‘লোকটাকে দেখেছেন?’

‘পেছন দিক থেকে এসে ধাক্কা মারলে আবার দেখা যায় নাকি-হেঃ!’

এই দুর্ঘটনার পর রুমটেকে থাকার আর কোনও মনে হয় না-হয়তো নিরাপদও নয়-তাই আমরা আবার বাড়িমুখে রওনা দিলাম। হেলমুটের একটু আপশোস হল, কারণ ও বলল, ছবি তোলার এত ভাল সাবজেক্ট ও এসে অবধি আর পায়নি। তবে নাচ আগামীকালও হবে, তাই ইচ্ছে করলে আরেকবার আসতে পারে।

ফেলুদা অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল—বোধহয় চিন্তা করছিল—কারণ ঘটনা এত দ্রুত ঘটে চলেছে, ওর মতো পরিষ্কার মাথাও হয়তো গুলিয়ে আসছিল। এবার সে নিশিকান্তবাবুকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'মশাই, আপনার একটা দায়িত্ব আছে সেটা বোধহয় বেশ ভাল করেই বুঝতে পারছেন।'

'দায়িত্ব?' ভদ্রলোকের গলা দিয়ে যেন পুরো আওয়াজ বেরোচ্ছে না।

'আপনি কার পিছনে লেগেছেন সেটা না বললে তো কে আপনার পিছনে লেগেছে সেটা বলা যাবে না।

নিশিকান্তবাবু ঢোক গিলে দু হাত তুলে কান মলে বললেন, 'কী সাক্ষী করে বলতে হবে বলুন—আমি বলছি।-জ্ঞানত আমি কোনও লোকের কোনও অনিষ্ট করিনি—কারুর পিছনে লাগিনি—এমনকী কারুর বদনাম পর্যন্ত করিনি।'

'আপনার কোনও যমজ ভাই-টাই নেই তো?'

'আজ্ঞে না স্যার। আই অ্যাম ওনলি অফ্‌স্প্রিং।'

'হুঁ...। মিথ্যে বললে অবিশ্যি আপনিই ঠকবেন। কাজেই ধরে নিচ্ছি। আপনি সত্যি কথাই বলছেন। কিন্তু...'

ফেলুদা চুপ করে গেল। আর সেই যে চুপ করল, সে একেবারে ডাকবাংলো পর্যন্ত। ডাকবাংলোতে এসে হেলমুট গাড়ি থেকে নেমে জিপের ভাড়ার শেয়ার দিতে যাওয়াতে

ফেলুদা বাধা দিল–'তোমাকে তো আমরাই ইনভাইট করেছি, আর তুমি আমাদের দেশে অতিথি–কাজেই তোমার পয়সা তো আমরা নেব না।'

'অল রাইট'–হেলমুট হেসে বলল, 'তা হলে একটু বসে চ খেয়ে যাও।'

নিশিকান্তবাবুরও আপত্তি নেই দেখে আমরা তিনজনেই জিপটাকে পাওনা চুকিয়ে ছেড়ে দিয়ে বাংলোয় হেলমুটের ঘরে গিয়ে হাজির হলাম।

তিনজনে চেয়ারে বসেছি। হেলমুট ঘাড় থেকে ক্যামেরা নামিয়ে টেবিলের উপর রেখে চায়ের অডার দিতে যাবে, এমন সময় একটা আওয়াজ পেয়ে দরজার দিকে চেয়ে দেখি একজন অদ্ভুত দেখতে ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে হেলমুটের দিকে চেয়ে হেসে 'হ্যালো' বললেন। ভদ্রলোকের মুখে কাঁচা-পাক চাপ দাড়ি, মাথাত কাঁচা-পাকা চুল প্রায় কাঁধ অবধি নেমেছে, গাতের উপর দিকে একটা গলাবন্ধ ঢলঢলে অরেঞ্জ রঙের সিকিম জ্যাকেট, আর তলার দিকে ঢিলে ফ্ল্যানেলের পাতলুন। তার হাতে একটা বেশ বড় হলদে লাঠিও রয়েছে–যাকে বোধহয় বলে যষ্ঠি।

হেলমুট আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'পরিচয় করিয়ে দিই-ইনিই ডক্টর বৈদ্য।'

৭. বঙ্গালি মনে হতেছে

‘আপনাদের দেখিয়ে বঙ্গালি মনে হতেছে।’

ডাক্তার বৈদ্য ঠিক আমার পাশের চেয়ারটায় বসলেন।

ফেলুদা বলল, ‘ঠিকই বলেছেন। ... আপনার কথা আমরা আগেই হেলমুটের কাছে শুনেছি।’

‘হেলমুট ইজ এ নাইস বয়।’

ভদ্রলোক ইংরেজি বাংলা হিন্দি তিনরকম ভাষা মিশিয়ে কথা বলে গেলেন।

‘তবে হেলমুটকে আমি বলেছি যে এদেশের একটা সংস্কারের কথা ও যেন না ভোলে। এরা বিশ্বাস করে যে যার যত বেশি ছবি তোলা হবে, তার তত বেশি আয়ু কমে যাবে। কারণ, এই যে আমি, এই আমার খানিকটা যদি অন্য কোনও বস্তুতেও থেকে থাকে, তার মানে আমার ভাইটাল ফোর্সের খানিকটাও নিশ্চয়ই সেই অন্য বস্তুর মধ্যে রয়েছে। এবং সেই পরিমাণে আমার নিজের ভাইটাল ফোর্সও নিশ্চয়ই কমে যাচ্ছে।’

‘আপনিও কি এতে বিশ্বাস করেন?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘করলেই বা কী?’ ডক্টর বৈদ্য হেসে বললেন। ‘হেলমুট কি আর আমার ছবি তুলতে বাদ রেখেছে? তবে কোনও জিনিস পরীক্ষা করে দেখার আগে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটা ওঠে। না। এখনও অনেক জিনিস শিখতে বাকি আছে, অনেক কিছু জানতে হবে, অনেক পরীক্ষা করতে হবে।’

ফেলুদা বলল, 'কিন্তু আপনি তো সে সব না করেই অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন বলে মনে হয়। শুনলাম। আপনি ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন, মৃত ব্যক্তির আত্মার সঙ্গে কথাবাতা বলতে পারেন।'

'সব সময় না!' বৈদ্য একটু মুচকি হাসলেন। 'পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর অনেকটা নির্ভর করে। কিছু জিনিস খুব সহজে বলে দেওয়া যায়। যেমন–' বৈদ্য নিশিকান্তবাবুর দিকে আঙুল দেখালেন–'ওই ভদ্রলোকটি কোনও কারণে অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় ভুগছেন।'

নিশিকান্তবাবু জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটলেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি ঠিকই বলেছেন। ওকে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি মৃত্যুভয় দেখাচ্ছেন। সেটা কে বলতে পারেন?'

ডক্টর বৈদ্য কিছুক্ষণের জন্য চোখ বন্ধ করলেন। তারপর চোখ খুলে জানালা দিয়ে বাইরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এজেন্ট।'

'এজেন্ট?' ফেলুদা প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, এজেন্ট। মানুষ অন্যায় করলে তার শাস্তি হবেই। অনেক সময় ভগবান নিজেই শাস্তি দেন, আবার অনেক সময় তাঁর এজেন্টরা এই কাজটা করে।'

নিশিকান্তবাবু হঠাৎ কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, 'দ্যাট ইজ অল। আমি আর শুনতে চাই না।'

বৈদ্য হেসে বললেন, 'আমি জোর করে কাউকে কিছু শোনাই না। ইনি জিজ্ঞেস করলেন, তাই বললাম। স্বেচ্ছায় লব্ধ জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনও জ্ঞানের কোনও মূল্য নেই। তবে একটা কথা বলতে চাই-বাঁচতে হলে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।'

'কাইন্ডলি এক্সপ্লেন', বললেন নিশিকান্তবাবু!'

'এর চেয়ে বেশি কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

চা এসে গিয়েছিল। হেলমুট নিজেই চা ঢেলে সবাইকে জিজ্ঞেস করে দুধ-চিনি মিশিয়ে আমাদের হাতে হাতে পেয়ালা তুলে দিল।

চায়ে চুমুক দিয়ে ফেলুদা বলল, 'আপনাদের সঙ্গে তো মিস্টার শৈলভাস্কারের আলাপ হয়েছিল৷'

বৈদ্য মাথা নেড়ে বললেন, 'বড় দুঃখের ব্যাপার। আমি ওকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম যে, ওর সময়টা ভাল যাচ্ছে না। অবিশ্যি অকস্মাৎ মৃত্যুর ব্যাপারে তো, কারুর কোনও হাত নেই; দোরোম পোরোবিংচিতেত বলেইছে–
হেম্র দোরমোং দোরজি সিংচিয়াম্
ওম পিরিয়ান হোতোরিবিরিচিয়াং!'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ বসে চ খেলাম। হেলমুট এই ফাঁকে তার টেবিলটা গোছগাছ করে নিল। নিশিকান্তবাবু চায়ের পেয়ালা হাতে করে বসে আছেন—বুঝতে পারছি তাঁর চা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে-কিন্তু খাবার কথাটা তাঁর যেন মনেই আসছে না। এর মধ্যে নিশ্চিন্ত দেখলাম ফেলুদাকে। কিম্বা তার মনে উদ্বেগ থাকলেও সেটা সে একেবারেই বাইরে প্রকাশ করছে না, দিব্যি একটার পর একটা বিস্কুট খেয়ে চলেছে।

বাইরে রোদ পড়ে আসছে। হেলমুট, সুইচ টিপল, কিন্তু বাতি জ্বলল না। কী ব্যাপার? নিশিকান্তবাবু বললেন, 'পাওয়ার গেছে। এটা প্রায়ই ঘটে।'

'বেয়ারাকে মোমবাতি দিতে বলি' বলে হেলমুট ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এবার ফেলুদা ডক্টর বৈদ্যকে আরেকটা প্রশ্ন করল।

'মিস্টার শৈলভাঙ্কারের মৃত্যু কি সত্যি আকস্মিকভাবে হয়েছিল বলে আপনার বিশ্বাস?

ডক্টর বৈদ্য হাতের পেয়ালা সামনের বেতের টেবিলের উপর রেখে হাত দুটোকে পেটের উপর জড়ো করে বললেন, ‘এ কথার উত্তর তো শুধু একজনই দিতে পারে। ’

‘কে?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘যে মৃত্যু–একমাত্র সে-ই সর্বজ্ঞ। তারই কাছে অজানা কিছু নেই। আমাদের জীবিতকালে অজস্র অবান্তর জিনিস আমাদের জ্ঞান ও অনুভূতির পথে বাধার সৃষ্টি করে। ওই যে জানালা খোলা রয়েছে–সে জানালা দিয়ে আমরা দুরের পাহাড় দেখতে পাচ্ছি, আকাশ দেখতে পাচ্ছি, পাহাড়ের গায়ে গাছপালা বাড়িঘর সব দেখতে পাচ্ছি, আকাশে মেঘ দেখতে পাচ্ছি। এ সব হল অবাস্তর জিনিস-নির্ভেজাল জ্ঞানের পথে এ সব দৃশ্যবস্তু বাধাস্বরূপ। অথচ জানালা যদি বন্ধ করে দিই তা হলে কী দেখব? ঘরে যদি আলো না থাকে, তা হলে বাইরের আলোর পথ বন্ধ করে দিলে কী থাকে? অন্ধকার। জীবন হল আলো, আর জীবন হল ওই জানালা দিয়ে দেখা দৃশ্য, যা আমাদের প্রকৃত জ্ঞানের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আর মৃত্যু হল বন্ধ জানালার ফলে যে অন্ধকার, সেই অন্ধকার। এই অন্ধকারের ফলে আমাদের অন্তর্ভুষ্টি খুলে যায়। মৃত্যুই হল অন্ধকারের চরম অবস্থা।’

এত বড় বক্তৃতা একটানা শুনে একটু বুঝতে কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু ভরসা ছিল যে ফেলুদা নিশ্চয়ই সব বুঝতে পারছে; ও বলল, ‘তা হলে আপনার মতে মিস্টার শেলভাঙ্কারই একমাত্র জানেন তাঁর মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল?’

‘মৃত্যুর মুহূর্তটিতে হয়তো জানত না–কিন্তু এখন নিশ্চয়ই জানে।’

কেন বলতে পারি না-আমার একটু গা ছমছম করতে শুরু করেছিল। হয়তো অন্ধকার বেড়ে আসছে বলেই; আর মৃত্যু-টিত্যু নিয়ে এত কথাবাতা, আর ডক্টর বৈদ্যর চশমার কাচে বেগুনি মেঘে ভরা আকাশের ছায়া, আর তাঁর অস্বাভাবিক রকম কাঁপা কাঁপা গলার স্বর, এমনকী তাঁর ঠোঁটের কোণে লেগে থাকা হাসিটাও কেমন জানি থমথমে মনে হচ্ছিল।

বেয়ারা ঘরে এসে চায়ের জিনিসপত্র তুলে নিয়ে তার জায়গায় টেবিলের উপর একটা জ্বালানো মোমবাতি রেখে চলে গেল। ফেলুদা সবাইকে চারমিনার অফার করল, আর সবাই রিফিউজ করল। তখন ও একই একটা সিগারেট ধরিয়ে পর পর দুটো রিং ছেড়ে বলল-'মিস্টার শেলভঙ্কারের মতামতটা জানতে পারলে মন্দ হত না।'

ফেলুদা অবিশ্যি প্ল্যানচেট-ট্যানচেট নিয়ে বই পড়েছে। ও বলে যে-জিনিসে বিশ্বাস নেই-সেই নিয়ে বইও পড়া উচিত না-এ কথাটা আমি মানি না। কারণ, যে বইটা লিখেছে, তার মতামতটা জানা মানে মানুষের চিন্তাধারার একটা বিশেষ দিক সম্বন্ধে জানা। ক্রাইম নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটি করবে, তাদের মানুষ সম্বন্ধে জানতেই হবে, আর মানুষ বলতে সব রকম মানুষই বোঝায়, কাউকেই বাদ দেওয়া চলে না।

ডক্টর বৈদ্য কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ছিলেন, হঠাৎ চোখ খুলে হাত দুটো উপরে তুলে বললেন, 'দরজা এবং জানালা দুটো বন্ধ করো।'

কথাটা বললেন, হুকুম করার ভঙ্গিতেই, আর সে হুকুম পালন করলেন নিশিকান্তবাবু। মনে হল তিনি যেন হিপ্‌নোটাইজড হয়ে প্রায় যন্ত্রের মানুষের মতো কাজটা করলেন।

জানালা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে মোমবাতির আবছা হলদে আলো ছাড়া ঘরে আর কোনও আলোই রইল না।

আমরা সবাই বেতের টেবিলটাকে ঘিরে বসেছিলাম। আমার ডান পাশে বৈদ্য, বা পাশে ফেলুদা। ফেলুদার অন্য পাশে নিশিকান্তবাবু। আর তার পাশে একটা মোড়ায় হেলমুট। ডক্টর বৈদ্য এবার বললেন, 'তোমাদের হাতগুলো উপুড় করে টেবিলের উপর রাখো। প্রত্যেকের হাত তার দুপাশের লোকের হাতের সঙ্গে ঠেকে থাকা চাই৷'

ডক্টর বৈদ্য এতক্ষণ আমাদের 'আপ' আর 'আপনি বলে বলছিলেন, এবার দেখলাম 'তুম' আর 'তুমি' আরম্ভ করলেন।

আমরা একে একে সবাই পরস্পরের সঙ্গে হাত ঠেকিয়ে টেবিলে রাখলাম! সব শেষে ডক্টর বৈদ্য আমার আর হেলমুটের হাতের মাঝখানে তাঁর নিজের হাত দুটো ওঁজে দিলেন। পাঁচ দশে পঞ্চাশটা উপুড় করা হাতের আঙুল এখন ফুলের পাপড়ির মতো মোমবাতিটাকে গোল করে ঘিরে বেতের টেবিলের উপর রাখা হয়েছে।

'তোমরা সবাই একদৃষ্টি মোমবাতির শিখার দিকে চেয়ে শেলভাঙ্কারের মৃত্যুর কথা চিন্তা করো।' ,

স্বপ্নে বাতাস ঢোকার কোনও রাস্তা নেই, তাই মোমবাতির শিখা একেবারে স্থিরভাবে জ্বলছে। অল্প অল্প করে মোম গলে বাতির গা বেয়ে গড়িয়ে বেতের বুনুনির ওপর জমা হচ্ছে? একটা ফড়িং জাতীয় পোক ঘরের ভিতরে ছিল, সেটা বাতির শিখার চারিদিকে পাক খেতে আরম্ভ করল।

কতক্ষণ যে এইভাবে বাতির দিকে চেয়েছিলাম জানি না। সত্যি বলতে কী, দু-একবার যে আড়াচোখে ডক্টর বৈদ্যর দিকে চেয়ে দেখিনি তা নয়-কিন্তু সেটা তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারেননি, কারণ তাঁর চোখ বন্ধ।

হঠাৎ—যেন অনেক দূর থেকে গলার স্বর আসছে—এইভাবে চিঁ চিঁ করে ডক্টর বৈদ্যর মুখ থেকে কথা বেরোল—'হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু নো?'

ফেলুদা বলল, 'শেলভাঙ্কার কি অ্যাক্সিডেন্টে মরেছিল?'

আবার সেই চিঁ চিঁ গলায় উত্তর এল-'নো।'

'তা হলে কীভাবে মরেছিলেন তিনি?'

কিছুক্ষণ সব চুপ। এখন আমরা সবাই মোমবাতি ছেড়ে ডক্টর বৈদ্যর মুখের দিকে চেয়ে আছি। তাঁর চোখ বন্ধ, মাথা পিছন দিকে হেলানো! হেলমুট দেখলাম তার নীল নিস্পলক চোখে ডক্টর বৈদ্যকে দেখছে। নিশিকান্তবাবুর কুতকুতে চোখও তাঁরই দিকে।

ঘরে হঠাৎ এক ঝলক নীল আলো। বাইরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

এবার আরও পরিষ্কার গলায় উত্তর এল– ‘মার্ডার।’

‘মার্ডার!’ এটা নিশিকান্তর গলা–শুকিয়ে খসখসে হয়ে গেছে। কথাটা একটানা পারলেন না। তিনি বললেন, ‘মা-হা-হারা-ডার!’

‘কে খুন করেছিল বলা সম্ভব কি?’ আবার ফেলুদাই প্রশ্ন করল।

আমার বুকের ভিতরে অসম্ভব টিপটিপানি আরম্ভ হয়েছে। নিশিকান্তবাবুর মতো আমারও গলা শুকিয়ে এসেছে। নেহাত কথা বলতে হচ্ছে না বলে, না হলে আমিও ধরা পড়ে যেতম।

আবার কিছুক্ষণের জন্য সব চুপ। ফেলুদা দেখলাম একদৃষ্টি ডক্টর বৈদ্যর হাতের দিকে দেখছে। ভদ্রলোক কয়েকবার খুব জোরে জোরে–যেন বেশ কষ্ট করে–নিশ্বাস নিলেন। তারপর উত্তর এল–’বীরেন্দ্র।’

বীরেন্দ্র? সে আবার কে?

ফেলুদাও নিশ্চয়ই এটা জানতে চাইত, কিন্তু ডক্টর বৈদ্য হঠাৎ তাঁর হাত দুটো টেবিলের উপর থেকে তুলে নিয়ে চোখ খুলে বললেন, ‘এ গ্লাস অফ ওয়াটার প্লিজ।’

হেলমুট মোড়া থেকে উঠে গিয়ে তার টেবিলের উপর রাখা ফ্লাস্ক থেকে গেলাসে জল ঢেলে বৈদ্যকে দিল। ভদ্রলোকের জল খাওয়া শেষ হলে পর ফেলুদা বলল, ‘বীরেন্দ্র যে কে, সেটা বোধহয় জানার কোনও সম্ভাবনা নেই?’

উত্তর এল হেলমুটের কাছ থেকে।

'বীরেন্দ্র মিস্টার শেলভাঙ্কারের ছেলের নাম। আমাকে বীরেন্দ্রর কথা বলেছেন তিনি। একবার নয়—অনেকবার।'

জানালা খুলে দিতে গিয়ে দেখি, বাইরে ইলেকট্রিকের আলো দেখা যাচ্ছে। হেলমুটও বোধহয় দেখেছিল, কারণ ও সুইচ টিপে দিল, আর ঘরের বাতি জ্বলে উঠল। ঘড়িতে দেখি পৌনে সাতটা। আমরা সকলেই উঠে পড়লাম।

ডক্টর বৈদ্য নিশিকান্তবাবুর কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'আপনাকে খুব নার্ভাস লোক বলে মনে হচ্ছে।'

নিশিকান্তবাবু একটু হেঁ হেঁ করলেন।

'যাক্ গে' ডক্টর বৈদ্য বললেন, 'মনে হয় আপনার ফাঁড়া কেটে গেছে।'

'ওঃ!' আহ্লাদে হাফ ছেড়ে নিশিকান্তবাবু তাঁর সব ক'টা দাঁত বার করে দিলেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি ক' দিন আছেন?'

ডক্টর বৈদ্য বললেন, 'কাল দিনটা ভাল থাকলে পেমিয়াংচি যাবার ইচ্ছে আছে। ওখানকার মনাস্টেরিতে অনেক পুঁথিপত্র আছে শুনেছি।'

'আপনি কি তিব্বত নিয়ে পড়াশুনা করছেন?'

'প্রাচীন সভ্যতা বলতে তো ওই একটি বাকি আছে। মিশর, ইরাক, মেসোপটেমিয়া—এ সব তো বহুকাল আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ভারতবর্ষে কী আছে বলুন—সবই পাঁচমেশালি। যা ছিল তিব্বতেই ছিল—একেবারে খাঁটি অবস্থায়—এই সেদিনও পর্যন্ত। এখন তো আর তিব্বতে যাবার কোনও মানে হয় না। সৌভাগ্যক্রমে এই সিকিমের মঠগুলোতে সেই পুরনো সভ্যতার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়।'

আমরা বাইরে বেরিয়ে এলাম। রাত্রে নির্ঘাত বৃষ্টি হবে। আকাশ কালো, আর মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক।

ডক্টর বৈদ্য বললেন, 'আপনারাও এসে পড়ুন না পেমিয়াংচি।'

ফেলুদা বলল, 'ঠিক কালই যেতে পারব বলে মনে হয় না। আপনি তো কয়েক দিন থাকবেন ওখানে?'

'অন্তত দিন চারেক থাকার ইচ্ছে আছে।'

'তা হলো হয়তো দেখা হতে পারে, কারণ পেমিয়াংচির কথা অনেকেই বলছে!'

'গেলে কিছু নুন সঙ্গে নিতে ভুলবেন না।' ডক্টর বৈদ্য হেসে বললেন।

'নুন?'

'জোঁক ছাড়াতে হলে নুন ছাড়া গতি নেই।'

৮. আমাদের হোটেলের রান্না

আমাদের হোটেলটা অন্যদিক দিয়ে খুব একটা কিছু না হলেও, রান্নাটা এখানে বেশ ভালই হয়-বিশেষ করে পাঁঠার মাংসের ঝোল। আমি আর ফেলুদা দুজনেই রাত্রে রুটি খাই, আর নিশিকান্তবাবু দুবেলাই খান ভাত। আজ তিনজনে এক সঙ্গে খেতে বসেছি। নিশিকান্তবাবু একটা নলি-হাড় চুষে চোঁ করে ম্যারো বার করে খেতে খেতে বললেন, 'ডিসেন্ট লোক মশাই৷'

'ডক্টর বৈদ্যর কথা বলছেন?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

'আশ্চর্য ক্ষমতা। কী রকম সব বলে-বলে দিলো৷'

ফেলুদা হেসে ঠাট্টার সুরে বলল, 'আপনার তো ভাল লাগবেই—বলেছে ফাঁড়া কেটে গেছে।-আর কী চাই।'

'আপনার বুঝি ওঁর কথাগুলো বিশ্বাস হয় না?'

'কথাগুলো যদি ফলে যায় তা হলে হবে নিশ্চয়ই। এখনও তো সে স্টেজে পৌঁছয়নি। এমনিতে এ সব লোকের উপর চট করে শ্রদ্ধা হওয়া কঠিন। এত বুজরুকের দল আছে। এ লাইনে।'

'কিন্তু সত্যি করে গুণী লোকও তো থাকতে পারে। এর কথাবাতরি স্টাইলই আলাদা। শুনলেই ইম্প্রেস্‌ড হতে হয়। আর যদি ধরুন গিয়ে মার্ডার হয়েই থাকে...'

ফেলুদা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল; কেন, সেটা বুঝতে পারলাম না; হয়তো মনের মধ্যে কোনও খট্‌কা রয়েছে। এত ভাল মাংস খাবার সময়ও তার চোখ থেকে ভ্রুকুটি যেতে চাইছে না।

'মার্ডারের কথা যে বললে সেটা আপনার বিশ্বাস হয়?' নিশিকান্তবাবু প্রশ্ন করলেন।

ফেলুদা বলল, 'হয়।'

'হয়?'

'হয়া'

'কেন বলুন তো।'

'কারণ আছে।'

এর বেশি আর ফেলুদা কিছু বলল না।

খাবার পরে কালকের মতোই দুজনে পান কিনতে বেরোলাম। বৃষ্টি এখনও নামেনি, তবে বাতাস একদম বন্ধ হয়ে গেছে। আজ আমাদের হোটেলের সামনে দিয়ে দু-একজন নতুন মুখকে হাঁটতে দেখলাম। তারা সবাই বিদেশি, বোধহয় আমেরিকান। এ সব বিদেশি টুরিস্টরা সাধারণত এসে 'নরখিল' বলে একটা হোটেলে থাকে; ওটাই এখানকার সবচেয়ে বড় হোটেল।

ফেলুদা পান খেয়ে রাস্তায় পায়চারি করতে আরম্ভ করেছিল, হঠাৎ থেমে বলল, 'সময় নষ্ট করে লাভ নেই। কিছু ক্যালকুলেশন আছে, সেরে ফেলি গে। তুই বরং এক কাজ কর। কাছাকাছির মধ্যে একটু ঘুরে আয়। আমি আধঘণ্টা আনডিস্টার্বড কাজ করতে চাই।'

ফেলুদা হোটেলে ফিরে গেল। ওর কাজে ব্যাঘাত করার ইচ্ছে বা সাহস কোনওটাই আমার নেই-বিশেষ করে তদন্তের এই জট পাকানো অবস্থায়।

দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় লোক নেই বেশি। হোটেলের কাছেই একটা বন্ধ দাােকানের সামনে কয়েকটা নেপালি গোল হয়ে বসে জুয়া খেলছে। মাঝে মাঝে খুঁটি নাড়ার শব্দ আর তাদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

আমি শহরের দিকের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। এখনও বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর তার সঙ্গে অনেক দূর থেকে মেঘের গর্জন। তবে মনে হয় না বৃষ্টি খুব শিগগির আসবে। ধীরে ধীরে তোড়জোড় চলেছে, নামবে গিয়ে হয়তো সেই মাঝরাত্রে।

রাস্তার বাতিগুলোর খুব জোর নেই, আর উপর দিক থেকে পড়ে বলে চেনা লোকের মুখ চিনতে সময় লাগে।

উলটোদিক থেকে কে যেন আসছে। এখনও প্রায় বিশ-ত্রিশ গজ দূরে৷ এবার একটা আলোর তলায় এসে পড়াতে মাথার ব্রাউন চুলটা চকচক করে উঠল।।

পরের আলোটায় পরিষ্কার চিনতে পারলাম হেলমুটকে। সে অন্যমনস্ক ভাবে মাটির দিকে চেয়ে হাঁটছে।

এখন দশ হাতের মধ্যে হেলমুট। তার ভুরু কুঁচকোনো, হাত দুটো প্যান্টের পকেটে গোঁজা।

হেলমুট আমার পাশ দিয়ে গটগটিয়ে হেঁটে চলে গেল, অথচ আমাকে যেন দেখতেই পেল না।

আমি মুখ ঘুরিয়ে হতভম্বভাবে কিছুক্ষণ ওর ক্রমে-ছোট-হয়ে-যাওয়া চেহারাটার দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে হোটেলের দিকে রওনা দিলাম।

ঘরে এসে দেখি ফেলুদা বুকের ওপর খাতা খুলে চিত হয়ে খাটে শুয়ে আছে। বললাম, ‘আধঘণ্টা হয়ে গেছে ফেলুদা।’

ফেলুদা বলল, 'সাসপেক্টের তালিকাটা আপ-টু-ডেট করে ফেললাম।'

আমি বললাম, 'বীরেন্দ্র শেলভাঙ্কার যে সাসপেক্ট সেটা তো আগেই জানতাম, শুধু নামটা জানা ছিল না। ডক্টর বৈদ্যও কি সাসপেক্ট?'

ফেলুদা একটু হেসে বলল, 'লোকটা ভেলকি দেখিয়েছে ভালই। অবিশ্যি, এমন ভেলকি যে সম্ভব নয় তা বলছি না। আর আজকের ব্যাপারে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে, বৈদ্যর শেলভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। শেলভাঙ্কার ওকে কী বলেছিল না-বলেছিল। সেটা না জানা অবধি এই বৈদ্য ভণ্ড-বৈদ্য না খাঁটি-বৈদ্য সেটা জানা যাবে না।'

'কিন্তু নিশিকান্তবাবুর ব্যাপারটা যে বলে দিল।'

'জলের মতো সোজা! নিশিকান্ত যে-রেটে নখ কামড়াচ্ছিল, তার নার্ভাসনেস বুঝতে অলৌকিক ক্ষমতার দরকার হয় না।'

'আর মার্ডার?'

'মার্ডার না বলে স্বাভাবিক মৃত্যু বললে নাটক জমে না। লোকটা এসেনশিয়ালি নাটুকে। অনেক গুণী লোকই নাটুকে হয়, অভিনয় পছন্দ করে, লোককে চমকে দিতে ভালবাসে। এটা মানুষের অনেকগুলো স্বাভাবিক প্রবৃত্তির মধ্যে একটা।'

'তা হলে সাসপেক্ট কাকে কাকে বলতে হয়?'

'যথারীতি সকলকেই।'

'ডক্টর বৈদ্যাও?'

'হোয়াই নট? মূর্তির কথাটা ভুলিস না।'

‘আর হেলমুট?’ আমি হেলমুটের ঘটনোটা বললাম।

ফেলুদা কিন্তু খুব বেশি অবাক হল না। বলল, ‘হেলমুটও যে রহস্যময় চরিত্র সেটা আমি আগেই বুঝেছি। ও বলছে প্রেফেশনাল ফোটোগ্রাফার, সিকিম সম্বন্ধে একটা ছবির বই করছে, অথচ রুমটেকে যে এত বড় একটা উৎসব হচ্ছে, সে খবরটা সে জানত না। এখানেই তো খট্‌কার কারণ রয়েছে।’

‘তার মানে কী হতে পারে?’

‘তার মানে এই যে, ওর এখানে থেকে যাওয়ার অন্য কোনও একটা কারণ রয়েছে যেটা ও আমাদের কাছে প্রকাশ করছে না।’

ফেলুদা আরও কিছুক্ষণ ধরে খাতায় হিজিবিজি লিখল। আমি আকাশ-পাতাল ভেবেও এই সব ঘটনার জট ছাড়াতে পারলাম না। আমরা এর আগেও অদ্ভুত সব রহস্যের জলে জড়িয়ে পড়েছি, কিন্তু কোনওটারই সমাধান এত কঠিন বলে মনে হয়নি। একবার মনে হল ফেলুদার পুলিশে খবর দেওয়া উচিত। ও একা কেন সমস্ত ব্যাপারটা ঘাড়ে নিচ্ছে? শেলভাঙ্কারকে যে-ই খুন করুক না কেন, সে যে একটা ডাকসাইটে ক্রিমিনাল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যদি সেই লোক ফেলুদার তদন্তের কথা জেনে ফেলে, আর ওকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে? কিন্তু তারপরেই আবার মনে হল, পুলিশ যদি ফেলুদার আগে খুনিকে ধরে ফেলে, তা হলে সেটা আমার মোটেই ভাল লাগবে না। তার চেয়ে ফেলুদা যা করছে তা একই করুক। যদি ও এই কঠিন রহস্যের সমাধান করতে পারে, তা হলে ওর গৌরব পঞ্চাশ গুণ বেড়ে যাবে।

পৌনে এগারোটার সময় নিশিকান্তবাবু দরজায় টোকা মেরে ‘গুড নাইট করে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ গল্পের বইটা পড়ার চেষ্টা করলাম। জুল ভার্নের ‘কার্পেথিয়ান কাস্‌ল’। জানি খুব ইন্টারেস্টিং বই, কিন্তু তাও মন বসল না। কিছুক্ষণ পরে বই বন্ধ করে চোখ

বুজলাম। ঘুম আসার আগে পর্যন্ত মাঝে মাঝে চোখ খুলে দেখেছি ফেলুদা তার খাতায় নোট করে চলেছে।।

মনে যত দুশ্চিন্তাই থাকুক না কেন–রাত্রে একবারও ঘুম ভাঙেনি। সকলে যখন উঠেছি, তখন জানালা দিয়ে পাহাড়ের গায়ে রোদ দেখা যাচ্ছে। ফেলুদা ঘরে নেই–বোধহয় স্নান করতে গেছে।

যেখানেই যাক–যাবার আগে তার খাটের উপর একটা সাদা কাগজ অ্যাশ-ট্রে চাপা দিয়ে রেখে গেছে–বোধহয় আমারই দেখার জন্য।

কাগজটা হাতে নিয়ে দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে।–আমাদের চেনা একটা তিব্বতি কথা–যার মানে হল মৃত্যু।

৯. আসলে ফেলুদা বাথরুমে যায়নি

আসলে ফেলুদা বাথরুমে যায়নি। ও খুব ভোর থাকতে উঠে নীচে চলে গিয়েছিল একটা টেলিফোন করতে। বম্বেতে ট্রাঙ্ক-কাল। আমি সুসান-টান সেরে নীচে গিয়ে দেখি ফেলুদা টেলিফোনে কথা বলছে। শেষ হলে পর জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার?' ও বলল, 'শশধরবাবু বম্বেতে নেই। আজ ভোরেই বেরিয়ে পড়েছেন। বোধহয় এখানেই আসছেন। আমার আগের টেলিগ্রামটাতে হয়তো কাজ হয়েছে।'

চা খেতে খেতে ফেলুদা বলল, 'আজ একটা এক্সপেরিমেন্ট করব। মনে হচ্ছে একটা ব্যাপারে একটু ছেলেমানুষি করে ফেলেছি। সেটা সত্যি কি না পরীক্ষা করে দেখতে হবে।'

এক্সপেরিমেন্টটা কী সেটা আর আগে থেকে জিজ্ঞেস করতে সাহস হল না। কোথায় সেটা হবে জিজ্ঞেস করাতে ফেলুদা বলল তার জন্য একটা নিরিবিলি জায়গা চাই। নিরিবিলি ধরা হলে হবে কি না জিজ্ঞেস করাতে ফেলুদা চটে গিয়ে বলল, 'তোর মুণ্ডু! ঘর তো হোটেলেই রয়েছে। চাই একটা রাস্তা, যেখানে লোকজনের ভিড় নেই। কারণ লোকে দেখে ফেললে ভাববে পাগল। একবার নাথুলা রোডের দিকটায় গিয়ে দেখতে হবে।'

সত্যি বলতে কী, এই দুদিনে গ্যাংটকের একটামাত্র রাস্তা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই দেখা হয়নি। তাই একটু হেঁটে বেড়াবার ছুতো পেয়ে ভালই লাগিছিল।

হোটেল থেকে বেরিয়েই ডক্টর বৈদ্যর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। রোদের বেশ ঝাঁঝ, তাই ভদ্রলোক দেখি সানগ্লাস পরেছেন। বললেন, 'কোথায় চললেন আপনারা?'

ফেলুদা বলল, 'শহরটা দেখাই হয়নি। ভাবছিলাম একটু ওপর দিকটায় যাব—প্যালেসের ও দিকে।'

'আমি যাচ্ছি গাড়ির সন্ধানে; আজ দিনটা ভাল আছে। এ গুড ডে টু মোক দ্যটি ট্রিপটু পেমিয়াংচি। আপনার না এলে কিন্তু একটা খুব ভাল জায়গা মিস করবেন।'

'যাবার তো ইচ্ছে আছে।'

'আমি থাকতে থাকতে চলে আসুন। গ্যাংটক জায়গাটা খুব সুবিধের না। বিশেষ করে আপনার পক্ষে নিরাপদ নয় মোটেই।'

ভদ্রলোক হাসিমুখে হাত নেড়ে চলে গেলেন।

আমি বললাম, 'হঠাৎ ওকথাটা বললেন কেন ভদ্রলোক?'

ফেলুদা হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তুখোড় আছেন বাবাজি। আমি যেমন ওকে সন্দেহ করছি, ও-ও তেমনি উলটে আমাকে সন্দেহ করছে। হয়তো বুঝে ফেলেছে যে আমি একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়ছি।'

'কিন্তু তোমাকে তো সত্যিই হুমকি দিয়ে লিখেছে ফেলুদা। খাটের উপর কাগজটা দেখলাম যে।'

'এটা কি নতুন জিনিস হল?'

'তা অবিশ্যি নয়।'

'তবে! তোর যদি ধারণা হয়ে থাকে যে, ওই একটা তিব্বতি কথার জন্য আমি তদন্ত বন্ধ করে দেব, তা হলে তুই ফেলুমিত্তিরকে এখনও চিনিসনি।'

মুখে সেটা না বললেও, মনে মনে বললাম যে যদি কেউ ফেলুমিত্তিরকে চেনে তবে সেটা আমিই। বাদশাহী আংটির ব্যাপারে হুমকি সত্ত্বেও কী সাংঘাতিক বিপদের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ফেলুদা সেটা তো আমি দেখেছি।

চড়াই রাস্তাটা উঠে ক্রমে ফ্ল্যাট হয়ে গিয়ে শেষটায় একটা প্রকাণ্ড চওড়া—প্রায় দার্জিলিং-এর ম্যালের মতো-খোলা জায়গায় এসে পড়েছে। সেটার মাঝখানে একটা নিচু রেলিং দিয়ে ঘেরা ফুলের কেয়ারি করা গোল জায়গা রয়েছে। আবার সেটার মাঝখানে একটা হলদে কাঠের পোস্টে এদিকে-ওদিকে পয়েন্ট করা সব রাস্তা আর জায়গার নাম লেখা ফলক রয়েছে। ডান দিকে যে ফলকটা পয়েন্ট করা, তাতে লেখা রয়েছে 'প্যালেস'। ডান দিকে চেয়ে দেখলাম, দুদিকে গাছের সারিওয়ালা একটা সোজা রাস্তার শেষ মাথায় একটা বাহারের গেট দেখা যাচ্ছে। বুঝলাম ওটাই হল প্যালেসের গেট।

বাঁ দিকে দেখানো ফলকটায় লেখা রয়েছে 'নাথুলা রোড।' আশেপাশে কোনও লোকজন নেই। দূরে প্যালেসের রাস্তায় কালকের দেখা বিদেশি টুরিস্টরা ক্যামেরা হাতে পায়চারি করছে। ফেলুদা বলল, 'লক্ষণ ভালই। চ' বাঁ দিকে চ' । '

যে নাথুলা রোড দিয়ে একেবারে বডক্টরে চলে যাওয়া যায়, সেটা দিয়ে আমি আর ফেলুদা এগিয়ে চললাম এক্সপেরিমেন্টের উদ্দেশ্যে। রাস্তাটা ক্রমেই নির্জন হয়ে এসেছে। ফেলুদা বাঁ দিকের খাড়াই পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলেছে। এদিকটা শহরের পুব দিক। কাঞ্চনজঙ্ঘা হল পশ্চিম দিকে। এ দিকে বরফ দেখা যায় না, তবে নীচে বহু দূরে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া একটা নদী দেখা যায়। আরেকটা জিনিস যেটা দেখা যায় সেটা হল রোপওয়ে। শূন্যে টাঙানো তারের রাস্তা দিয়ে ঝুলন্ত গাড়ি চলেছে মাল নিয়ে পাহাড়ের এ-মাথার এক স্টেশন থেকে ও-মাথার আরেক স্টেশনে।

রোপওয়ে দেখতে এত ভাল লাগছিল যে ফেলুদার প্রথম ডাকটা শুনতেই পাইনি। তারপর শুনলাম, 'অ্যাই তোপসে—এদিকে আয়?'

পাহাড়ের গা বেয়ে খানিক দূরে উঠে গেছে ফেলুদা, আর সেখান থেকে আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আমিও উঠে গেলাম! ফেলুদার পাশে একটা পাথর পড়ে আছে–সাইজে সেটা একটা পাঁচ নম্বরের ফুটবলের মতো।

‘এই পাথরের পাশে দাঁড়া।’

দাঁড়ালাম। এ রকম বাধ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট, কোনও গোয়েন্দা কখনও পেয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

‘আমি যাচ্ছি নীচে! ও দিক থেকে এ দিকে হেঁটে যাব। আমি যখন বলব, তখন তুই পাথরটা ঠেলে নীচের দিকে গড়িয়ে দিবি। যেভাবে রয়েছে পাথরটা, বুঝতেই পারছিস একটা ঠেলা দিলেই ওটা নীচের দিকে গড়িয়ে যাবে। পারবি তো?’

‘জলের মতো সোজা।’

ফেলুদা নীচে নেমে যেদিক দিয়ে এসেছি, সেদিকটায় চলে গেল। তারপর শুনতে পেলাম ওর হাক–‘রেডি?’

আমি চেঁচিয়ে বললাম ‘রেডি’–আর তারপরেই পেলাম ফেলুদার প্যায়ের আওয়াজ।

আমার লাইনে আসার আট-দশ পা আগেই ফেলুদা চেঁচিয়ে উঠল–’গো!’ আমি পাথর ঠেলে দিলাম। ফেলুদা হাঁটা থামাল না। দেখলাম পাথর গড়িয়ে রাস্তায় পৌঁছনোর আগেই ফেলুদা তার অন্তত দশ পা সামনে এগিয়ে চলে গেছে।

‘দাঁড়া!’

ফেলুদা ফিরে এল, সঙ্গে পাথর।

‘এবার তুই নীচে যা! তোকে হাঁটতে হবে। হাঁটা থামাবি না। আমি পাথর ফেলব। যদি দেখিস পাথর তোর দিকে তাগ করে আসছে–হয়তো তোর গায়ে এসে লাগবে–তুই, লাফিয়ে পাশ কাটাতে পারুবি তো?’

'জলের মতো সহজ।'

এবার আমি হাঁটতে শুরু করলাম—আড়চোখ পাহাড়ের দিকে। ফেলুদা খুব হিসেব করে জিভটিব কামড়ে একটা বিশেষ টাইমে পাথরটাকে মারল ঠেলা। আমি থামলাম না। লাফিয়ে পাশ কাটানোরও দরকার হল না। পাথর আমি পৌঁছনোর আগেই রাস্তায় পড়ে দুটো পাক খেয়ে ডান দিকের পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে চলে গেল।

ফেলুদা যেখানে ছিল সেখানেই বসে পড়ল। কী আর করি।—আমিও তার কাছে গিয়ে হাজির হলাম।

'কী মূর্খ আমি! কী মূখ্য! এই সহজ—'

ফেলুদার কথা শেষ হল না। একটা শব্দ আমার কানে আসতেই এক ঝলক উপরে তাকিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে আমি ফেলুদাকে তার জায়গা থেকে প্রায় তিন হতে পাশে সরিয়ে আনলাম, আর ঠিক সেই মুহুর্তেই একটা বিরাট পাথরের চাই এক সেকেন্ড আগে যেখানে ফেলুদা ছিল, সেখান দিয়ে গড়িয়ে গিয়ে বুনো লাল ফুলের একটা প্রকাণ্ড ঝোপড়াকে তছনছ করে দিয়ে রাস্তায় একবার মাত্র ঠোক্কর দিয়ে পিছনের ঢাল দিয়ে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফেলুদা 'জায়গাটা সত্যিই নিরাপদ নয়' বলে আমার হাত ধরে টেনে একেবারে রাস্তায়। তারপর দুজনে আর টু শব্দটি না করে পা চালিয়ে এক নিশ্বাসে একেবারে তেমাথায় পৌঁছে গেলাম! একটা মিলিটারি লরি আমাদের পাশ কাটিয়ে নাথুলার দিকে চলে গেল। ফেলুদা খালি একবার মৃদুস্বরে বলল, 'থ্যাঙ্কস, তোপসে।' তার দিকে চেয়ে দেখি সে গভীর হয়ে গেছে। আমার মনের যে কী অবস্থা সে আর বলে কাজ নেই।

কাছেই একটা ছাউনি দেওয়া বসবার ঘর ছিল। অনেকটা ইডেন গার্ডেনের ব্যান্ডস্ট্যান্ডের মতো দেখতে। আমরা তার ভিতরে গিয়ে বেঞ্চিতে বসে হাঁপা ছাড়লাম। ফেলুদা কপালের ঘাম মুছে বলল—

'কাউকে দেখতে পেয়েছিলি?'

বললাম, 'না। অনেক উঁচু থেকে পাথরটা এসেছিল। আমি যখন দেখেছি তখনই তার ভেলোসিটি অনেক।'

ফেলুদা একটা সিগারেট ধরিয়ে ভাল করে একটা টান দিয়ে বলল, 'আর টিলেঢালা চলবে না! একটা কুইক এসপার-ওসপার হওয়া দরকার।'

আমি বললাম, 'কিন্তু অনেক প্রশ্নের তো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না ফেলুদা।'

'কে বললে তোকে?' ফেলুদা খোঁকিয়ে উঠল।'কাল রাত্রে কখন ঘুমিয়েছি জানিস? আড়াইটে। ফেলুমিত্তির ঘোড়ার ঘাস কাটছে না। এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল। যা সন্দেহ করেছিলাম। তাই! পাথর এসে গাড়িতে পড়েনি। ওয়ান ইন এ মিলিয়ন চান্সের উপর নির্ভর করে কেউ খুন করে না। প্ল্যানটা ছিল অন্য, কিন্তু সেটাকে অ্যাক্সিডেন্টের চেহারা দেবার জন্য পাথরটা ফেলা হয়েছিল। মিস্টার শেলভাস্করকে অজ্ঞান করা হয়েছিল। আগেই। তারপর তাকে জিপ সমেত খাদের মধ্যে ফেলা হয়েছিল, তারপর সব শেষে ফেলা হয়েছিল পাথর।'

'কিন্তু তা হলে...ড্রাইভারটা যে...'

'ড্রাইভারকে হাত করা হয়েছিল। এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই, কারণ এ ছাড়া জিনিসটা সম্ভব নয়।'

'কিম্বা ড্রাইভার তো নিজেই খুন করে থাকতে পারে?'

'না। কারণ, মোটিভ কী? তার পক্ষে মূর্তিটার কথা জানার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল বলে মনে হয় না।'

ফেলুদা উঠে পড়ল।

'আমাদের টার্গেট হচ্ছে SKM 463।'

কিন্তু দুঃখের বিষয় SKM 463-এর খোঁজ করে তাকে পাওয়া গেল না। সে গাড়ি কাল রাত্রেই নাকি শিলিগুড়ি চলে গেছে।

'আসলে কী জানিস, জিপটা নতুন বলে সকলেরই ওটার উপর চোখ। ওটা তাই আর বসে থাকে না।'

'তা হলে আমরা কী করব?'

'দাঁড়া, একটু ভাবতে দে। সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।'

জিপ-স্ট্যান্ড থেকে হোটেলে ফিরে এলাম। ডাইনিং রুমে বসে বেয়ারাকে ডেকে কোল্ড ড্রিঙ্কের অর্ডার দিলাম। ফেলুদার চোখ লাল, চুল উসকো-খুসকো, মুঠো করা ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের তেলোতে বার বার ব্যর্থ ঘুষি মারছে।

'কবে পৌঁছেছি আমরা এখানে?' সে হঠাৎ প্রশ্ন করল।

'চোদ্দই এপ্রিল।'

'চোদ্দই না পনেরোই?'

'চোদ্দোই। তুমি ভুলে যাচ্ছ ফেলুদা—সেদিন ছিল পয়লা বৈশাখ-'

'ইয়েস ইয়েস। আর খুন হয়েছে কবে?'

'এগারোই।'

'সেদিন গ্যাংটকে ছিল শেলভাঙ্কার, নিশিকান্ত, হেলমুট আর ডক্টর বৈদ্য।'

'ধরে নিচ্ছি বীরেন্দ্রও ছিল। ধরে নিচ্ছি প্রাইটেক্স ভুল করেনি। আচ্ছা...নিশিকান্তবাবুর জানালা দিয়ে কবে কাগজ ফেলল?'

'যেদিন আমরা এসেছি, সেদিনই রাত্রে।'

'চোদ্দই রাত্রে। গুড। সে সময় কে কে ছিল শহরে?'

'হেলমুট, শশধর, ধরে নিচ্ছি বীরেন্দ্র, আর...আর..'

'নিশিকান্ত।'

'নিশিকান্ত তো থাকবেই।'

'শুধু থাকবেই না। ও যদি কোনও গোলমাল করে থাকে, তা হলো নিজের উপর থেকে সন্দেহ হটিয়ে দেবার জন্য নিজেই নিজের ঘরে কাগজ ফেলতে পারে, নিজেই খাদের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে 'হেলপ বলে চিৎকার করতে পারে৷'

'কী গোলমাল করতে পারেন নিশিকান্তবাবু?'

'সেটা এখনও জানি না। খুন করার সাহস ওর আছে বলে মনে হয় না। লোকটা নেহাতই ভিতু, আর সেটা অভিনয় নয়।'

'তা হলে আর কেউ বাকি রইল কি?'

'ডক্টর বৈদ্য! ডক্টর বৈদ্যকে বাদ দিবি না। তিনি কবে কালিম্পং গেছেন, বা অ্যাট অল গেছেন কি না–সেটা তো আমরা জানি না। ডাকবাংলো থেকে যে অন্য জায়গায় গিয়ে ঘাপটি মেরে বসে থাকেননি তার গ্যারান্টি কী?'

ফেলুদা এক চুমুকে এক গেলাস সিকিম অরেঞ্জ শেষ করে বলল, 'একমাত্র শশধরবাবুর গতিবিধি সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নেই–কারণ তিনি আমাদের সঙ্গে একই প্লেনে একই জিপে গ্যাংটক এসেছেন, এবং পরদিন বম্বে ফিরে গেছেন; ফিরে যে গেছেন সেটা তাঁর বাড়ির লোকে টেলিফোনে কনফার্ম করেছে। অবিশ্যি এখন তিনি বম্বেতে নেই। একটা চান্স আছে, হি ইজ অন হিজ ওয়ে হিয়ার। মনে হচ্ছে পেমিয়াংচিটা–'

ফেলুদা কথা থামাল। বাইরে থেকে একজন লোক এসে হোটেলের ভিতর ঢুকে ম্যানেজারের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। লোকটা আমাদের জার্মান হিপি হেলমুট উঙ্গার। ম্যানেজারকে কী জিজ্ঞেস করাতে তিনি আমাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিলেন।

'ওঃ–তোমরা এখানেই আছ? আমি দেখতেই পাইনি।' আমরা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। হেলমুটের যেন একটু কিন্তু কিন্তু ভাব। বলল, 'একটা জরুরি আলোচনা ছিল। তোমাদের ঘরে যাওয়া যায় কি?'

১০. ঘরে এসে ঢোকার পর

ঘরে এসে ঢোকার পর হেলমুট বলল, ‘মে আই ক্লোজ দ্য ডোর?’ তারপর নিজেই গিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

আমার বুকের ভিতরে চিপ টিপ। বিরাট লম্বা লোক—ফেলুদার চেয়েও এক ইঞ্চি বেশি। তার উপর জার্মান। তার উপরে শুনেছি হিপিরা নানারকম নেশা করে। আর বিদেশিদের সঙ্গে বন্দুক-পিস্তল গোছের জিনিস থাকাটা কিছুই আশ্চর্য নয়। যদি কোনও বদ মতলবে এসে থাকে লোকটা?

ফেলুদা হেলমুটের দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিল।

‘কোল্ড ড্রিঙ্ক বা চা-কফি কিছু চলবে?’

‘নো, থ্যাঙ্কস।’

হেলমুট কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে বিছানার উপর রেখে বগলদাবা করা আগ্‌ফা কোম্পানির একটা বড় লাল খামের ভেতর হাত ঢুকিয়ে বলল, ‘তোমাদের কয়েকটা ছবি দেখাতে এনেছি। এগুলো কালার নেগেটিভে তোলা। এখানে প্রিন্ট হয় না, তাই দার্জিলিং-এ পাঠিয়েছিলাম। আজই সকলে এনলার্জমেন্টগুলো হয়ে এসেছে।’

হেলমুট একটা ছবি বার করল।

‘এটা নর্থ সিকিম হাইওয়েতে তোলা! অ্যাক্সিডেন্টটা যেখানে হয়, সেখান থেকে রাস্তাটা পাহাড়ের গা দিয়ে গা দিয়ে একেবারে উলটোদিকের পাহাড়ে চলে গেছে। সরু ফিতের মতো রাস্তাটাকে অ্যাক্সিডেন্টের জায়গা থেকে দেখা যায়। আমি ছবিটা তুলেছি। ওই উলটোদিকের রাস্তা থেকেই। গ্রাম, নদী আর দশ কিলোমিটার দূরে সিকিমের খানিকটা

অংশ মিলিয়ে একটা চমৎকার ভিউ পাওয়া যায় ওখান থেকে। কথা ছিল শেলভাঙ্কার গুম্‌ফা যাবার পথে আমাকে ওখান থেকে তুলে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার গাড়ি আমার কাছ অবধি পৌঁছায়নি। ছবি তুলতে তুলতে একটা শব্দ পেয়ে সেদিকে মুখ ঘুরিয়ে আমি এই দৃশ্যটা পাই, যেটা আমি আমার টেলিফটো লেন্‌স দিয়ে তুলে রাখি।'

আশ্চর্য ছবি। এত দূর থেকে তোলা সত্ত্বেও মোটামুটি সবই বেশ বোঝা যাচ্ছে। একটা জিপ পাহাড়ের গা দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে। তার কিছু উপরে রাস্তায় একটা লোক দাঁড়িয়ে পড়ন্ত জিপটার দিকে দেখছে। এটা বোধহয় ড্রাইভারটা। মুখ চেনার উপায় নেই, কিন্তু সে যে নীল রঙের জামা পরা রয়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে। এ ছাড়া আর কোনও লোক ছবিটাতে নেই।

এবার হেলমুট আরেকটা ছবি বার করল। এটা আগেরটার কয়েক সেকেন্ড পরে তোলা। এটা আরও অদ্ভুত ছবি। এটার তলার দিকে দেখা যাচ্ছে জিপটা পাহাড়ের গায়ে ভাঙা অবস্থায় কত হয়ে পড়ে আছে। আর ডান পাশে কিছু উপরে একটা ঝোপের পিছনে একটা কালো সুটপরা লোকের খানিকটা অংশ মাটিতে শোওয়া অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ছবির উপর দিকে রাস্তায় ড্রাইভারটা। এবার কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে পিছন করে মাথা উঁচু করে উপর দিকে দেখছে। ছবির একেবারে উপরের অংশে পাহাড়ের গায়ে এবার আরেকজন নতুন লোককে দেখা যাচ্ছে; তারও মুখ চেনার কোনও উপায় নেই, কিন্তু গায়ের জামার রং লালচে। সে একটা বড় পাথরের পিছনে উপুড় হয়ে রয়েছে।

তৃতীয় ছবিতে লাল পোশাক পরা লোকটাকে আর দেখা যাচ্ছে না; নীল জামা পরা লোকটা দৌড়ানোর ভঙ্গিতে ছবি থেকে প্রায় বেরিয়ে চলে গেছে; গাড়ি আর কালো স্যুটপরা লোকটা যেমন ছিল তেমনই আছে। আর পাহাড়ের গায়ে যে পাথরটা ছিল, সেটা পড়ে। আছে রাস্তার উপর, একটা গাছের পাশে।

'রিমার্কেবল', ফেলুদা বলে উঠল, 'অদ্ভুত ছবি। এ রকম ছবি আমি কমই দেখেছি।'

‘এ রকম সুযোগও কমই পাওয়া যায়’, হেলমুট বলল।

‘তুমি ছবিগুলো তোলার পর কী করলে?’

‘গ্যাংটকে ফিরে এলাম। হেঁটেই গিয়েছিলাম-হেঁটেই ফিরলাম। অ্যাক্সিডেন্টের জায়গায় পৌঁছনোর আগেই শেলভাঙ্কারকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমি গিয়ে শুধু পাথর আর ভাঙা জিপ দেখেছি। গ্যাংটকে ঢুকতেই অ্যাক্সিডেন্টের খবর পেয়েছি, আর পেয়েই সোজা হাসপাতালে চলে গেছি। আমি যাবার পরেও শেলভাঙ্কার ঘণ্টা দু-এক বেঁচে ছিলেন।’

‘তোমার ছবি তোলার ব্যাপারটা তুমি কাউকে বলোনি?’

‘বলে কী লাভ? যতক্ষণ না সে-ছবি প্রিন্ট হয়ে আসছে, ততক্ষণ তো সেটাকে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। মুখের কথা কে বিশ্বাস করবে! অথচ আমি সেই মুহূর্ত থেকেই জানি ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছিল, জানি যে জিনিসটা অ্যাক্সিডেন্ট নয়, খুন। আরও কাছ থেকে তুললে অবিশ্যি খুনির চেহারাটাও বোঝা যেত। কিন্তু বুঝতেই পারছি সেটা সম্ভব ছিল না।‘

ফেলুদা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ছবিগুলো দেখতে দেখতে বলল, ‘ওই লাল পোশাক পরা লোকটা কি তা হলে বীরেন্দ্র?’

‘ইম্পসিবল।’ দৃঢ় গলায় বলে উঠল। হেলমুট।

আমরা দুজনেই রীতিমতো অবাক হয়ে তার দিকে চাইলাম।

‘মানে?’ ফেলুদা বলল।

‘তুমি অত শিওর হচ্ছে কী করে?’

‘কারণ আমিই হচ্ছি বীরেন্দ্র শেলভাঙ্কার।’

ফেলুদার চোখ ছানাবড়া হতে এই প্রথম দেখলাম।

‘তুমি বীরেন্দ্র মানে? তোমার চুল কটা, তোমার চোখ নীল, তোমার ইংরেজিতে জার্মান টান...’

‘ভেরি সিম্পল।’ হেলমুট চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। ‘আমার বাবা দুবার বিয়ে করেন। আমি প্রথম স্ত্রীর সন্তান। আমার মা ছিলেন জার্মান। বাবা যখন হাইডেলবার্গে ছাত্র ছিলেন, তখনই আলাপ, আর বিদেশে থাকতেই বাবা বিয়ে করেন। মা-র নাম ছিল হেল্‌গা। বিয়ের আগের পদবি ছিল উঙ্গার। আমি যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে জার্মানি গিয়ে সেটল করি, তখন বীরেন্দ্র নামটা ছেড়ে হেলমুট নামটা নিই, আর মা-র পদবিটা নিই।’

আমার মাথা ভোঁ ভোঁ করছে। সত্যিই তো—জার্মান স্ত্রী হলে ছেলের চেহারা সাহেবের মতো হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়।

‘বড়ি ছেড়ে চলে গেলে কেন?’ ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

‘মা মারা যাবার পাঁচ বছর পর বাবা যখন দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন, তখন মনটা ভেঙে গেল। মাকে আমি ভীষণ ভালবাসতাম। বাবার উপরেও টান ছিল, কিন্তু ঘটনাটার পর মনটা কেমন জানি বিগড়ে গেল। বাবার উপর একটা ঘৃণার ভাব এল মনে। তাই সব ছেড়েছুড়ে চলে গেলাম। বহু কষ্ট করে, বহুবার নিজের জীবন বিপন্ন করে অবশেষে আমি ইউরোপে পৌঁছই। গোড়ায় কয়েক বছর কুলিগিরি থেকে এমন কোনও কাজ নেই যা করিনি। প্রায় সাত-আট বছর এইভাবে কষ্টে কাটে। তারপর ছবি তুলতে শিখি। ভাল ফটোগ্রাফার হিসাবে নামও হয়। অনেক পত্রিকায় আমার তোলা ইউরোপের অনেক দেশের ছবি ছাপা হয়। বছর চারেক আগে ফ্লোরেন্সে ছবি তুলছিলাম, সেখানে হঠাৎ বাবার এক বন্ধুর সামনে পড়ে যাই। তিনি আমাকে চিনে ফেলেন, আর তিনিই বাবাকে আমার সম্বন্ধে লিখে জানান। তারপর বাবা ডিটেকটিভ লাগান আমাকে খুঁজে বার করার জন্য। সেই থেকে দাড়ি রাখতে শুরু করি, আর আমার চোখের মণির রংটাও বদলে ফেলি।’

'কনট্যাকট লেন্স?' ফেলুদা বলে উঠল।

হেলমুট একটু হেসে তার দুই চোখের ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে দুটো পাতলা লেন্স খুলে বার করে আমাদের দিকে তাকাল। অবাক হয়ে দেখলাম যে তার চোখ আমাদেরই মতো কালো হয়ে গেছে। পরমুহূর্তেই আবার লেনুস দুটো পরে নিয়ে হেলমুট বলে চলল—

'বছর খানেক আগে এক হিপির দলের সঙ্গে ভিড়ে ভারতবর্ষে আসি। দেশের উপর থেকে টান আমার কোনওদিনও যায়নি। আমার পিছনে তখনও লোক লেগে ছিল। বাবা অনেক পয়সা খরচ করেছেন এই খোঁজার ব্যাপারে। কাঠমাণ্ডুতে গিয়ে একটা মনাস্টেরিতে ছিলাম। যখন দেখলাম। সেখানেও পিছনে টিকটিকি ঘুরছে, তখন সিকিমে চলে এলাম।'

ফেলুদা বলল, 'তোমাকে ফিরে পেয়ে তোমার বাবা খুশি হননি?'

'আমাকে চিনতেই পারেননি! আমি আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছি অনেক। তার উপরে আমার লম্বা চুল, আমার গোঁফ-দাড়ি, আমার চোখের নীল রং—এই সব কারণেই বোধহয় তিনি নিজের ছেলেকে চিনতেই পারলেন না; আমার কাছে বসে তিনি বীরেন্দ্র সম্বন্ধে আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। ভারতবর্ষে ফিরে আসার আগেই বাবার উপর থেকে আমার বিরূপ ভাবটা অনেকটা চলে গিয়েছিল; বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ অনেক জিনিস মেনে নিতে শেখে। কিন্তু যখন দেখলাম তিনি আমাকে চিনলেন না, তখন আর নিজের পরিচয়টা দিলাম না। শেষ পর্যন্ত হয়তো দিতাম, কিন্তু তার আর সুযোগ হল কই?'

'খুনি কে, এ-সম্বন্ধে তোমার কোনও ধারণা আছে?'

'ফ্র্যাঙ্কলি বলব?'

'নিশ্চয়ই।'

'আমার মতে ডক্টর বৈদ্যুকে কোনও মতেই পালাতে দেওয়া উচিত নয়।'

ফেলুদা সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আমি এ-ব্যাপারে তোমার সঙ্গে একমত।'

হেলমুট (নাকি বীরেন্দ্র বলা উচিত?) বলল, ' ও তো জানে না। আমিই বীরেন্দ্র, তাই ফস করে আমার সামনেই কালকে ওই নামটাই করে দিল। আর যে মুহূর্তে নামটা করল, সেই মুহূর্তেই আমার লোকটা সম্বন্ধে ধারণা সম্পূর্ণ পালটে গেল। আমার মতে লোকটা এক নম্বরের ভণ্ড শয়তান। ও-ই খুন করেছে। এবং ও-ই মূর্তিটা নিয়েছে।'

ফেলুদা বলল, 'সেদিন শেলভাঙ্কার যখন গুম্‌ফাটা দেখতে যান, উনি কি একই যান?'

'সেটা বলতে পারি না। আমি তো অনেক সকলে বেরিয়ে পড়েছিলাম। অবিশ্যি ডক্টর বৈদ্য তাঁকে মাঝপথে থামিয়ে গাড়িতে উঠে থাকতে পারেন। সন্দেহ বাতিকটা বাবার একেবারেই ছিল না। এমনিতে অত্যন্ত সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি।'

ফেলুদা বিছানা ছেড়ে উঠে গভীরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করে বলল, 'আমাদের সঙ্গে পেমিয়াংচি যাবে?'

হেলমুট দৃঢ়স্বরে বলল, 'বাবাকে যে খুন করেছে, তার হাতে হাতকড়া পরানোর জন্য আমি যে-কোনও জায়গায় যেতে প্রস্তুত আছি।'

'এখান থেকে কত দূর জানো জায়গাটা?'

'একশো মাইলের কাছাকাছি বলে শুনেছি। হয়তো সামান্য বেশিও হতে পারে।'

'তার মানে ছ-সাত ঘণ্টা ধাক্কা।'

'রাস্তা খারাপ না হলে আরও তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যেতে পারে। আমার মতে আজই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়া উচিত।'

ফেলুদা বলল, 'আমারও তাই মত। আমি একটা জিপের ব্যবস্থা দেখছি। জিনিসপত্র সঙ্গে বেশি না নেওয়াই ভাল।'

'তুমি জিপ দেখো, আমি ডাকবাংলোর বুকিংটা সেরে রাখছি। বাই দ্য ওয়ে–' হেলমুট ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে থেমে ফেলুদার দিকে ঘুরে বলল, 'লোকটা যে-পরিমাণে ডেঞ্জারাস বলে মনে হচ্ছে, ওর কাছে বন্দুক-টন্দুক থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়। এদিকে আমার কাছে তো ফ্ল্যাশ-গান ছাড়া আর কিছুই নেই! তোমাদের কাছে–'

হেলমুটের কথা শেষ হবার আগেই ফেলুদা তার সুটকেসের ভিতর হাত ঢুকিয়ে রিভলবারটা বার করে হেলমুটকে দেখিয়ে দিল।

'আর এই যে আমার কার্ড।'

ফেলুদা তার 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর' লেখা ভিজিটিং কার্ডের একটা হেলমুটের দিকে এগিয়ে দিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেদিন আর কোনও জিপ ভাড়া পাওয়া গেল না। যে ক'টা ছিল, সবগুলো আমেরিকান টুরিস্টরা নিয়ে সারাদিনের জন্য রুমটেক চলে গেছে। আগামীকাল সকালের জন্য জিপের ব্যবস্থা করে বেশির ভাগ দিনটাই হেঁটে গ্যাংটক শহর দেখে কাটিয়ে দিলাম। দুপুরে বাজারের দিকটায় নিশিকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা হল। তাঁকে পেমিয়াংচির কথা বলতে তিনি অবিশ্যি লাফিয়ে উঠলেন।

সন্ধের দিকে ভদ্রলোক একটা অদ্ভুত জিনিস। এনে আমাদের দেখালেন। হাতখনেক লম্বা একটা লাঠি, তার ডগায় বাঁধা ছোট্ট একটা কাপড়ের থলি।

'কী জিনিস বলুন তো এটা', একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলেন নিশিকান্তবাবু। 'জানেন না তো? এই থলের ভিতর আছে নুন আর তামাকপাত। পায়ে যদি জোঁক ধরে, এই থলির একটা ঘষাতেই বাবাজি খসে পড়বেন।'

ফেলুদা জিজ্ঞেস করল, 'নাইলনের মোজা ভেদ করেও জোঁক ঢোকে নাকি?'

'কিছুই বিশ্বাস নেই মশাই। গেঞ্জি, শার্ট আর ডবল পুলওভার ভেদ করেও বুকের রক্ত খেতে দেখেছি জোঁককে। আর মজা কী জানেন তো? ধরুন, লাইন করে একদল লোক চলেছে জোঁকের জায়গা দিয়ে। এখন, জোঁকের তো চোখ নেই–জোঁক দেখতে পায় না–মাটির ভাইব্রেশনে বুঝতে পারে কোনও প্রাণী আসছে! লাইনের মাথায় যে লোক থাকবে, তাকে জোঁক অ্যাটাক করবে না–কিন্তু তার ভাইব্রেশনে তারা সজাগ হবে। দ্বিতীয় লোকের বেলা তারা মাথা উঁচিয়ে উঠবে, আর থার্ড যিনি রয়েছেন, তাঁর আর নিস্তার নেই–তাঁকে ধরবেই।'

ঠিক হল আমরা প্রত্যেকেই একটা করে জোঁক-ছাড়ানো লাঠি সঙ্গে নিয়ে নেব।

শুতে যাবার আগে ফেলুদা বলল, 'দুদিন বাদেই বুদ্ধ-পূর্ণিমা—এখানে উৎসব হবে।'

'সে উৎসব কি আমরা দেখতে পাব? আমি ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলাম।

'জানি না। তবে তার চেয়েও অনেক বড় পুণ্য কাজ হবে। যদি আমরা শেলভাঙ্কারের হত্যাকারীকে কব্জা করতে পারি।'

সারারাত আকাশ পরিষ্কার ছিল, আর আমাদের জানালা দিয়ে ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যাচ্ছিল।

পরদিন ভোর পাঁচটায় আমি, ফেলুদা, হেলমুট আর নিশিকান্ত সরকার সামান্য জিনিসপত্র, চারটে কাগজের বাক্সে হোটেলের তৈরি দুপুরের লাঞ্চ আর চারখানা জোঁক-ছাড়ানো লাঠি নিয়ে দুর্গগা বলে পেমিয়াংচির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।

১১. গ্যাংটক থেকে পেমিয়াংচি

গ্যাংটক থেকে পেমিয়াংচি যাবার দুটো রাস্তা আছে–একটা কিউশিং হয়ে, আরেকটা নামচি দিয়ে নয়াবাজার হয়ে। কিউশিং-এর রাস্তা দিয়ে গেলে দূরটা কম হয়, কিন্তু গত ক'দিনের বৃষ্টিতে সে রাস্তা নাকি খারাপ হয়ে গেছে, তাই আমাদের নয়াবাজার দিয়েই যেতে হবে। একশো সাতাশ মাইল পথ। এমনিতে হয়তো দুপুরের খাওয়াটা সারার জন্য নামচিতে থামতে হত, কিন্তু আমরা হোটেল থেকে লুচি, আলুর তরকারি আর মাংসের কাটলেট নিয়ে নিয়েছি। তা ছাড়া দুটো ফ্লাস্কে রয়েছে জল, আর দুটোতে গরম কফি; কাজেই পথে আর খাওয়ার জন্য থামতে হবে না। সাবধানে গেলেও ঘণ্টা আষ্ট্রেকের বেশি সময় লাগা উচিত নয়। তাই মনে হয়, বিকেলের আগেই আমরা পেমিয়াংচি পৌঁছে যাব। হেলমুট দেখলাম একটার বেশি ক্যামেরা সঙ্গে নেয়নি, আর নিশিকান্তবাবু দেখি কোত্থেকে একজোড়া চামড়ার গোলোস জুতো সঙ্গে নিয়ে নিয়েছেন। বললেন, 'ভেবে দেখলাম, জোঁক যদি পায়ের পিছন দিকে ধরে, তা হলে তো আর দেখতে পাব না! নুনের থলি কোন কাজটা দেবে মশাই? তার চেয়ে এই গামবুটই ভাল–সেন্ট পারসেন্ট সেফসাইড।'

'যদি গাছ থেকে মাথায় পড়ে জোঁক?' ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।

নিশিকান্তবাবু মাথা নাড়লেন। 'ম্যাক–মানে ম্যাক্সিমাম জোঁকের টাইম এটা নয়। সেটা আরও পরে–জুলাই অগাস্টে। এখন বাবাজিরা সব মাটিতেই থাকেন।'

নিশিকান্তবাবুকে বলা হয়নি যে আমরা খুনির সন্ধানে চলেছি। উনি জানেন আমরা ফুর্তি করতে যাচ্ছি, তাই দিব্যি নিশ্চিন্তে আছেন। ওখানে গোলাগুলি চললে যে ওঁর কী দশা হবে তা জানি না।

সোয়া ছ'টার সময়ে আমরা সিংথাম, পৌঁছে গেলাম। এ জায়গাটা গ্যাংটক আসার সময়ও পড়েছিল। বাজারের মধ্যে দিয়ে রাস্তা গেছে। বেশ গিজগিজে ছোট শহর, তিস্তার পাশেই।

আমরা বাঁ দিকে ঘুরে তিস্তার উপর দিয়ে একটা ব্রিজ পেরিয়ে উলটোদিকের পাহাড়ে উঠলাম। এখান থেকে শুরু করে বাকি রাস্তাটা হবে আমাদের কাছে নতুন।

আমাদের জিপটা নতুন না হলেও খুব বেশি পুরনো নয়। স্পিডোমিটার, মাইলোমিটার, দুটোই এখনও কাজ করছে, সিটের চামড়া-টামড়াও বিশেষ ছেড়েনি। ড্রাইভারের চেহারাটা দেখবার মতো। লোকটা বোধহয় নেপালি নয়, কারণ নেপালিরা সাধারণত বেঁটে হয়-এ রীতিমতো লম্বা। কালো প্যান্ট, কালো চামড়ার জার্কিন, আর কালো শার্ট পরেছে। শার্টের বোতাম। গলা অবধি লাগানো। মাথায় একটা কাপ পরেছে। যেটার রংও প্রায় কালোই। আমেরিকান গ্যাংস্টার ছবিতে মাঝে মাঝে এ রকম চেহারার লোক দেখা যায়। ফেলুদা ওর নাম জিজ্ঞেস করতে বলল ‘ থোণ্ডুপ।’ নিশিকান্তবাবু বিজ্ঞের মতো বললেন, ‘তিব্বতি নাম।’

ব্রিজ পেরিয়ে পাহাড়ের গা দিয়ে উঠতে উঠতে বুঝলাম, এদিকের দৃশ্য একেবারে অন্য রকম। গাছপালা অনেক কম, আর মাটিটা লালচে। আর শুকনো। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন বিহারের কোনও পাহাড়ে জায়গা দিয়ে চলেছি। এক-এক জায়গায় রাস্তা খুবই খারাপ-আর তার মানেই সেখানে রাস্তা সারানোর কাজ হচ্ছে। নেপালি ছেলে-মেয়ের দল হয় পাথর সরাচ্ছে, না হয় পাথর ভাঙছে, না হয় মাটি ফেলছে। এই দু দিনে নেপালি মেয়েদের দেখে কী করে চিনতে হয়, সেটা ফেলুদার কাছে শিখে নিয়েছি। এদের কানে মাকড়ি, নাকে নথ আর গলায় মোটা হাঁসুলি। সিকিমের মেয়েরা প্রায় গয়না পরে না বললেই চলে। অবিশ্যি পোশাকেও তফাত আছে।

গ্যাংটক থেকে নামচি হল চৌষট্টি মাইল। আমি মাইল পোস্টের দিকে চোখ রাখছিলাম। বাইশ মাইল পেরোনোর কিছু পরেই কানে একটা শব্দ এল। পিছন থেকে একটা জিপ বার বার হর্ন দিচ্ছে। থোণ্ডুপ কিন্তু পাশ দেবার কোনও আগ্রহ না দেখিয়ে কেবল আমাদের গাড়ির স্পিডটা একটু বাড়িয়ে দিল। ফেলুদা বলল, ‘ও গাড়ির এত তাড়া কীসের?’

থোণ্ডুপ বলল, ‘হার্ন দিক ও। ওকে এগোতে দিলে আপনাদের ধুলো খেতে হবে।’

সেদিনের মতোই ফেলুদা আর আমি সামনে বসেছিলাম, আর পিছনে হেলমুট। আর নিশিকান্ত। আমরা স্পিড বাড়ানো সত্ত্বেও পিছনের জিপটা বার বার এগিয়ে আসছে আর হর্ন দিচ্ছে, এমন সময় নিশিকান্তবাবু চেচিয়ে উঠলেন,–'আরে, এ যে সেই ভদ্রলোক?'

'কোন ভদ্রলোক?' বলে ফেলুদা পিছনে ফিরল, আর সেই সঙ্গে আমিও।

ও মা-এ যে শশধর বাবু! আমাদের পিছনে ফিরতে দেখে আবার গ্যা গ্যা করে হর্ন, আর শশধর বাবুর মরিয়া হয়ে হাত নাড়া।

ফেলুদা বলল, 'জারা রোক দিজিয়ে থোড়ুপজি–পিছনে চেনা লোক।'

আমাদের গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গেই পিছনেরটাও থামল, আর শশধরবাবু নেমে আমাদের দিকে দৌড়ে এলেন।

'আপনারা তো আচ্ছ লোক মশাই–সিংথামে এত চেঁচালুম আর শুনতেই পেলেন না।'

ফেলুদা অপ্রস্তুত। বলল, 'আরে আপনি আসছেন জানলে কি আর আপনাকে ছেড়ে আসি?'

'তা আপনি যেরকম টেলিগ্রাম করলেন তাতে কি আর ওখানে বসে থাকা যায়? আমি সেই তখন থেকে ফলো করছি আপনাদের।'

পিছনে থাকলে যে কী রকম ধুলো খেতে হয়, সেটা শশধরবাবুর চেহারা দেখেই বুঝতে পারছিলাম। আর কিছুক্ষণ এইভাবে চললে ভদ্রলোক একেবারে ভস্মমাখা সাধুবাবা হয়ে যেতেন।

'কিন্তু ব্যাপার কী? এই বললেন সন্দেহজনক ব্যাপার, আর সেসব ছেড়েছুড়ে এখন এ দিকে কোথায় চলেছেন?'

ফেলুদা এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে বলল, ‘আপনার সঙ্গে মালপত্তর কি অনেক?’

‘মোটেই না। কেবল একটা সুটকেস।’

‘তা হলে এক কাজ করা যাক। আপনার গাড়িটা সঙ্গে সঙ্গে চলুক; ওতে বরং আমাদের মালগুলো চাপিয়ে দিই! আপনি আমাদের এটার পেছনে বসে আসতে পারবেন তো?’

‘নিশ্চয়ই!’

জিপ চলতে চলতে ফেলুদা গত দুদিনের ঘটনাগুলো শশধরবাবুকে বলল। এমনকী হেলমুটের আসল পরিচয়টাও দিয়ে দিল। সব শুনেটুনে শশধরবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, ‘বাট হুইজ দিস ডক্টর বৈদ্য? শুনেই তো ভণ্ড বলে মনে হচ্ছে। আজকের দিনে এ সব বুজরুর্কির প্রশ্রয় দেওয়ার কোনও মানে হয় না। আপনাদের ওর হাবভাব দেখেই ওকে

সোজাসুজি হুমকি দেওয়া উচিত ছিল। সেটা না করে আপনারা ওকে পেমিয়াংচি পালাতে দিলেন? সত্যি, আপনাদের কাছ থেকে–‘

ফেলুদা বাধা দিয়ে বলল, ‘হেলমুটের আসল পরিচয়টা পাওয়াতেই তো ওর উপর সন্দেহটা গেল। আর আপনার দিক থেকেও খানিকটা গলতি হয়েছে। শশধরবাবু। আপনি তো একবারও বলেননি, শেলভাঙ্কারের প্রথম স্ত্রী জার্মান ছিলেন।’

শশধরবাবু বললেন, ‘আরে সে কি আজকের কথা মশাই? তাও জার্মান বলে জানতুমই না। বিদেশি, এইটুকুই শুনেছি। শেলভাঙ্কার প্রথম বিয়ে করে আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে। ... আই হোপ, বৈদ্য ব্যাটা সেখান থেকে সটকে পড়েনি। না হলে এই এতখানি পথ যাওয়াটাই বৃথা হবে।’

নামচি পৌঁছালাম ন'টার কিছু পরে। আকাশে মেঘা জমতে শুরু করেছে; তবে নামচিতে নাকি বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। এটা নাকি সিকিমের সবচেয়ে শুকনো আর সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর জায়গা। তা ছাড়া সুন্দরও বটে, আর আশ্চর্য রকম পরিচ্ছন্ন। তা সত্ত্বেও আমরা মিনিট দিশেকের বেশি থামলাম না। যেটুকু থামা, সেটুকু শুধু গাড়ির পেটে একটু ঠাণ্ডা জল, আর আমাদের পেটে একটু গরম কফি ঢালার জন্য। হেলমুট এর ফাঁকেই কয়েকটা ছবি তুলে নিল৷ লক্ষ করলাম, সে কথা-টথা বিশেষ বলছে না। ছবিটা তোলা যেন অভ্যাসের বশে। শশধর বাবুও চিন্তিত ও গম্ভীর। নিশিকান্তবাবু ফেলুদার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে একটু ঘাবড়েছেন বটেই, তবে ভিতরে ভিতরে মনে হল অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধটা পেয়ে তিনি বেশ একটা রোমাঞ্চ বোধ করছেন। নামচির বাজার থেকে একটা কমললেবু কিনে খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বললেন, 'বিপদ যাই আসুক না কেন মশাই, একদিকে প্রদোষবাবু আর একদিকে জার্মান বীরেনবাবুকে নিয়ে ডরাবার কোনও কারণ দেখছি না।'

নামচি থেকে রাস্তা নামতে নামতে একেবারে নদীর লেভেলে পৌঁছে যায়। এই নদীর ধারেই নয়াবাজার। সেখান থেকে আবার একটা ব্রিজ পেরিয়ে অনেকখানি পথ এই নদীর ধার দিয়ে উঠে না হাজার ফুটের উপর পেমিয়াংচি; এ নদী তিস্তা নয়। এর জল তিস্তার মতো ঘোলা নয়। এর জল স্বচ্ছ সবুজ। মাঝে মাঝে জলের স্রোত পাথরে বাধা পেয়ে ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠছে। এ নদীর নাম রঙ্গিত। এত সুন্দর পাহাড়ে নদী এর আগে আমি কখনও দেখিনি।

রঙ্গিতের পাশ দিয়ে পাক খেয়ে পাক খেয়ে আমরা যে পাহাড়ের উপর উঠছি, তাতে গাছপালা অনেক বেশি। এখানে মাটি লাল নয়, আর শুকনো নয়। এ যে বিহারের কোনও পাহাড় নয়, এ যে হিমালয়, তাতে কোনও ভুল নেই। শশধর বাবু বলেছিলেন ইয়াং মাউনটেনস–তাই ধস নামে। সেই ধসের যে কত চিহ্ন আশেপাশে পাহাড়ের গায়ে ছড়িয়ে রয়েছে, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। সবুজ পাহাড়ের গায়ে এখানে-ওখানে ছাই রঙের সব ক্ষতচিহ্ন–ঠিক মনে হয়। পাহাড়ের পায়ে বুঝি, শ্বেত হয়েছে। অজস্র গাছপালা বনবাদাড় সমেত পাহাড়ের এক-একটা অংশ ধসে পড়েছে। একেবারে নদীর কিনারে।

এই সব ন্যাড়া অংশ নতুন করে গাছপালা হয়ে আবার কবে পাশের সবুজের সঙ্গে মিশে যাবে তা কে জানে।

একটা গুম্‌ফার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখি সেই ভূত-তাড়ানো নিশানের ঝাড়। সবগুলো নিশানই তকতকে নতুন বলে মনে হচ্ছে। শশধরবাবু বললেন, 'সামনে বুদ্ধ পূর্ণিমা—তারই তোড়জোড় চলছে।'

ফেলুদা প্রথমে বোধহয় কথাটা শোনেনি। প্রায় মিনিট খানেক পরে বলল, 'কত তারিখে পড়ছে বুদ্ধ পূর্ণিমা?

শশধরবাবু বললেন, 'কালই বোধহয় পূর্ণিমা। কাল হল ১৭ই এপ্রিল।'

'সতেরোই এপ্রিল...তার মানে হল চৌঠা বৈশাখ... চৌঠা বৈশাখ...' ফেলুদার বিড়বিড়ানি জিপের শব্দে আর কেউ বোধহয় শোনেনি। তারিখ নিয়ে এত কী চিন্তা করছে ফেলুদা? আর ও এত গভীর কেন? আর হাতের আঙুল মটকাচ্ছে কেন?

পেমিয়াংচির আগের শহরের নাম গেজিং। এখানেও দেখি নিশানের ছড়াছড়ি। এখান থেকে পেমিয়াংচি তিন মাইল। জিপ ক্রমশ উপরে উঠছে। রাস্তা রীতিমতো খাড়াই। এখানে গাছ কম, তবে উপরের দিকে চাইলেই দেখতে পাচ্ছি। কালচে সবুজ রঙের ঘন বন। খানিকটা রাস্তা রীতিমতো খারাপ। জিপকে খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে। মনে হল এ দিকে বৃষ্টিটা গ্যাংটকের চেয়ে বেশি হয়েছে। জিপ ফেগর-হুইলে অতি সন্তর্পণে একটা গোলমেলে এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা পেরোল; ঝাঁকুনির চোটে নিশিকান্তবাবুর মাথাটা জিপের উপরের লোহার রডের সঙ্গে ঠকং করে লাগায় ভদ্রলোক 'উরেশ্‌শা' বলে উঠলেন।

একটু পরেই ক্রমে আলো কমে এল। এটা শুধু মেঘের জন্যে নয়। আমাদের জিপের এক পাশে এখন একটা গাঢ় সবুজ পাতা আর সাদা ডালপালাওয়ালা গাছের বন। হেলমুট বলল, 'ওগুলো বার্চ গাছ-বিলেতে খুব দেখা যায়।'

এখন আমাদের জিপ এই বনের মধ্যেই রাস্তা দিয়ে চলেছে। আমাদের দু পাশে বন। তার মধ্যে দিয়ে আমরা চড়াই উঠছি সাপের মতো প্যাচালো রাস্তা দিয়ে।

এবার আরও গভীর বন, আরও বড় বড় গাছ। ঠাণ্ড স্যাতসেঁতে হাওয়া। জিপের আওয়াজ ছাপিয়ে বনের ভিতর থেকে অচেনা পাখির তীক্ষ শিস। নিশিকান্তবাবু বললেন, ‘বেশ থ্রি–মানে থ্রিলিং লাগছে৷’

রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল।

সামনে একটা সবুজ টিপি। উপরে খোলা মেঘলা আকাশ।

ক্রমে একটা বাংলোর টালিওয়ালা ছাদ দেখা গেল। তারপর পুরো বাংলোটা। এই সেই ব্রিটিশ আমলের বিখ্যাত বাংলো। পিছন দিকে আকাশের নীচে সবুজ থেকে আবছা নীল হয়ে যাওয়া থরে থরে সাজানো পাহাড়।

জিপ থামল। আমরা নামালাম। চৌকিদার বেরিয়ে এল। আমাদের জন্য ঘর ঠিক করা আছে।

‘আউর কোই হ্যায়। ইঁহা?’ শশধরবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

’নেহি সাব–বাংলা খালি হ্যায়।’

‘আর কেউ নেই? এবার ফেলুদা জিজ্ঞেস করল।’আর কেউ আসেনি?’

‘এসেছিল। তিনি কাল রাত্রেই চলে গেছেন। দাড়িওয়ালা চশমাপরা বাবু।’

১২. শশধর বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন

চৌকিদারের কথা শুনে হেলমুটই সবচেয়ে বেশি হতাশ হয়েছে বলে মনে হল। সে কাঁধ থেকে ক্যামেরা নামিয়ে ঘাসের উপর বসে পড়ল।

শশধরবাবু বললেন, 'যা বুঝছি-ইমিডিয়েটলি কিছু করার নেই। একটা বাজে। অন্তত ডান হাতের ব্যাপারটা সোরে নেওয়া যাক।'

আমরা মালপত্র সমেত বাংলোর ভিতরে গিয়ে ঢুকলাম। দেখেই বোঝা যায় আদ্যিকালের বাংলো। কাঠের ছাত, কাঠের মেঝে, সামনের দিকে কাঠের রেলিংওয়ালা বারান্দা, তাতেঁ পুরনো ধরনের বেতের টেবিল-চেয়ার পাতা। বারান্দা থেকে সামনের দৃশ্য অদ্ভুত সুন্দর। এখন মেঘ করে আছে, তা না হলে নাকি বাইশ মাইলের মধ্যে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায়। এক পাখির ডাক ছাড়া চারিদিকে কোনও আওয়োজ নেই। সব নিঝুম নিস্তব্ধ।

বারান্দা দিয়ে ঢুকে সামনের ঘরটা হল ডাইনিং রুম। টেবিলের চারিদিকে চেয়ার পাতা রয়েছে। এক পাশে আবার দুটো আরাম কেদারা। শশধর বাবু তার একটায় বসে পড়ে ফেলুদাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'আপনি ডিটেকটিভ হলেও আপনার অনুমান ঠিক কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছিল। কিন্তু বৈদ্য লোকটা এভাবে পালানোতে এখন আমি কনভিন্স্ড। এস. এস. তার এমন একটা দামি জিনিস যাকে-তাকে দেখিয়ে খুব ভুল করেছে।'

হেলমুট বারান্দাতেই রয়ে গেল। নিশিকান্তবাবু বোধহয় বাথরুমের খোঁজে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন। ফেলুদা বাংলোর অন্য ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। আমি আর কী করি–খাবার টেবিলের পাশেই একটা চেয়ারে বসে পড়লাম। এত দূর আসা বৃথা হবে, শেলভাঙ্কারের আততায়ী অল্পের জন্য হাত থেকে ফসকে বেরিয়ে যাবে, আমরা বোকার মতো দৃশ্য দেখে গ্যাংটকে ফিরে যাব–এসব কথা ভাবতেও খারাপ লাগছিল।

ডাইনিং রুমের পিছন দিকের দুটো দরজা দিয়ে দুটো বেডরুমে যাওয়া যায়। ডান দিকের দরজাটা দিয়ে ফেলুদা বেরিয়ে এল, হাতে একটা লাঠি।

এই লাঠিটাই ডক্টর বৈদ্যর হাতে দেখছিলাম না?

'ভদ্রলোক এসেছিলেন ঠিকই', ফেলুদার গলার স্বর শুকনো আর ভারী, 'কারণ তিনি চিহ্নস্বরূপ তাঁর লাঠিটা ফেলে গেছেন। ভেরি স্ট্রেঞ্জ।'

নিশিকান্তবাবু রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকলেন। তারপর 'অদ্ভুত জায়গা' বলে আমার পাশের চেয়ারটায় বসে বিশ্রী শব্দ করে হাই তুললেন।

ফেলুদা বসল না। ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে ডক্টর বৈদ্যর লাঠিটা ডান হাতে নিয়ে বাঁ হাতের তেলোয় ঠক্ ঠক্ করে অন্যমনস্ক ভাবে ঠুকতে লাগল।

শশধরবাবু বললেন, 'কই, মিস্টার সরকার-আপনাদের ওই খাবারের বাক্সগুলো খুলুন! মিথ্যে খিদে বাড়িয়ে লাভটা কী?'

'খাওয়া পরে হবে।'

কথাটা বলল ফেলুদা। আর যেভাবে বলল তাতে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নিশিকান্তবাবু। উঠতে গিয়ে থাতমত খেয়ে থাপ করে আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। শশধরবাবুও অবাক হয়ে ফেলুদার দিকে চাইলেন। কিন্তু ফেলুদা আবার যেই কে সেই!

সে চেয়ারে বসল। লাঠিটা টেবিলের উপর শুইয়ে রেখে পকেট থেকে একটা চারমিনার বার করে ধরিয়ে দুটো টান দিয়ে বলল, 'ঘাটশিলায় আমার এক পুরনো বন্ধু রয়েছে। আপনি এখানে আসার আগে তো ঘাটশিলায় গিয়েছিলেন-তাই না, শশধর বাবু?'

শশধরবাবুর জবাব দিতে দেরি হল না।

‘হ্যাঁ–এক ভাগনের বিয়ে ছিল।’

‘আপনি তো হিন্দু?’

হঠাৎ এ-প্রশ্ন করল কেন ফেলুদা?

‘তার মানে?’ শশধরবাবু ভুরু কুঁচকে তাকালেন ফেলুদার দিকে।

‘নাকি বৌদ্ধ–না খ্রিস্টানা–না ব্রাহ্ম–না মুসলমান?

‘হোয়াট ডু ইউ মিন?’

‘বলুন না।’

‘হিন্দু-ন্যাচারেলি।’

‘হুঁ!’ ফেলুদা গভীরভাবে সিগারেটে টান দিয়ে দুটো রিং ছাড়ল। তার একটা বড় হতে হতে শশধরবাবুর মুখের কাছে গিয়ে মিলিয়ে গেল।

‘কিন্তু–‘ ফেলুদার চোখে ভ্রুকুটি, দৃষ্টি সোজা শশধরবাবুর দিকে, ‘-আপনি আর আমরা তো এক দিনে এক সঙ্গে প্লেনে এলাম। আপনি তখন সবে ঘাটশিলা থেকে বিয়ে সেরে ফিরছেন, তাই না?’

‘এতে আপনি গোলমালটা কোথায় দেখছেন মিস্টার মিত্তির? আপনার কথার কোনও মাথামুণ্ডু আমি খুঁজে পাচ্ছি না। ঘাটশিলার বিয়ের সঙ্গে আজকের ঘটনার কী সম্পর্ক?’

‘সম্পর্ক এই যে, চৈত্র মাসে তো হিন্দুদের বিয়ে হয় না শশধরবাবু! ওটা যে নিষিদ্ধ মাস! ও মাসে কোনও লগ্ন নেই।–শাস্ত্রের বারণ! আপনি সেই চৈত্র মাসেই আপনার ভাগনের বিয়ে দিলেন?’

শশধরবাবু সিগারেট ধরাতে গিয়ে থেমে গেলেন। কিংবা পারলেন না। তাঁর হাত দুটো কাঁপছে।

'আপনি কী ইমপ্লাই করছেন? কী বলতে চাইছেন আপনি?'

ফেলুদা নিরুদ্বেগ। সে চেয়ে রয়েছে সোজা শশধরবাবুর দিকে, তার চোখের পাতা পড়ছে না।

প্রায় পুরো এক মিনিট এইভাবে তাকিয়ে থেকে সে বলল, 'ইমপ্লাই করছি অনেক কিছু। এক নম্বর–আপনি মিথ্যেবাদী। আপনি ঘাটশিলায় যাননি। দু নম্বর—আপনি বিশ্বাসঘাতক—'

'মানে? শশধর বাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

'আমরা জানি শেলভাঙ্কার কোনও একটা কারণে ভীষণ মুষড়ে পড়েছিলেন। সেকথা তিনি বীরেন্দ্রকে বলেছিলেন—যদিও কারণ বলেননি। অনেক সময় খুব কাছের কোনও লোকের দ্বারা প্রতারিত হলে এ-জিনিসটা হয়। আমার বিশ্বাস সে-লোক হলেন আপনি। আপনি ছিলেন তাঁর পার্টনার। তিনি ছিলেন সরল, বিশ্বাসী মানুষ। তাঁর সন্দেহ-বাতিকটা ছিল না একেবারেই। সুতরাং তাঁকে ঠকাবার অনেক সুযোগ ছিল। আপনি সে-সুযোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিলেন–এবং জানতে পেরে তাঁর মন ভেঙে গিয়েছিল। তাঁর জানার ব্যাপারটা আপনি জানতে পারেন–আর জানার পর থেকেই তাঁকে সরাবার পথ খুঁজছিলেন। বম্বেতে সেটার সুবিধে হয়নি। তিনি সিকিমে এলেন। আপনার আসার কথা ছিল না। আপনিও এলেন। হয়তো তিনি আসার পরের দিনই। আপনি মানে নট শশধর বোস, বাট ডক্টর বৈদ্য—অর্থাৎ ছদ্মবেশী শশধর বোস। বৈদ্য শেলভাঙ্কারের সঙ্গে আলাপ করল, গণৎকার সেজে তাঁর বিষয় জানা কথাগুলোই তাঁকে বলল, তাঁকে ইম্প্রেস করল। দুজনে একসঙ্গে গুম্‌ফায় গেলেন বীরেন্দ্রর খোঁজ করতে। আপনি নিশ্চয়ই গাড়ির ব্যবস্থা করেছিলেন। পথে পিছন দিক থেকে মাথায় লাঠির বাড়ি

মেরে তাঁকে অজ্ঞান করলেন। ড্রাইভারকে আগেই হাত করেছিলেন-পয়সায় কী না হয়। তারপর গাড়ি ফেলা। তারপর পাথর ফেলা-আপনার ওই লাঠির সাহায্যে। তখনও শেলভাঙ্কার মরেননি। হয়তো তিনি শেষ মুহূর্তে আপনাকে চিনে ফেলেছিলেন, এবং সেই কারণেই মরবার আগে আপনার নাম করেন।'

'ননসেন্স ' শশধরবাবু চিৎকার করে উঠলেন, 'কী আবোল-তাবোল বকছেন আপনি! কী প্রমাণ আছে যে আমি ডক্টর বৈদ্য?'

ফেলুদা এবার একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল।

'আপনার আংটিটা কোথায় গেল শশধর বাবু?'

শশধরবাবু কী রকম ভাবোচাকা খেয়ে গেলেন।

'আমার...'

'হ্যাঁ, আপনার। আপনার 'মা' লেখা সোনার আংটি। আঙুলে দাগ রয়েছে, অথচ আংটি নেই কেন?

'ও-ওটা...' শশধর বাবু ঢোক গিললেন, '-ওটা আঙুলে টাইট হচ্ছিল, তাই-' ভদ্রলোক কোটের পকেট থেকে আংটি বার করে দেখালেন।

'মেক-আপ চেঞ্জ করে পরতে ভুলে গেছিলেন—তাই না? ওই একই আঙুলের দাগ সেদিন মোমবাতির আলোয় দেখেছিলাম শশধর বাবু। তখনই একটা খট্‌কা লেগেছিল, কিন্তু কেন তা বুঝতে পারিনি।'

শশধরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন-ফেলুদা গর্জন করে উঠল—'বসুন। আরও আছে?'

শশধরবাবু বসলেন, ঘাম মুছলেন। ফেলুদা বলে চলল—

'শেলভাঙ্কার খুন হল। ডক্টর বৈদ্য তার পরের দিন বললেন কালিম্পং যাচ্ছেন লামার সঙ্গে দেখা করতে। আসলে কিন্তু তা নয়! আসলে ডক্টর বৈদ্য ওরফে শশধর বোস চলে এলেন কলকাতায়। এদিকে শশধর বোস আগেই টেলিগ্রাম করেছিলেন 'অ্যারাইভিং ফোর্টিনথ'। সেটা পেয়ে শেলভাঙ্কার বিস্মিত ও বিচলিত হন–কারণ আপনার সিকিমে আসার কোনও কথা ছিল না–এবং শেলভাঙ্কার আপনাকে অ্যাভয়েড করতেই চাইছিলেন। যাই হোক–আপনি ফোর্টিন্থ এলেন—কারণ এই আসাটাই হবে আপনার অ্যালিবাই। চোদ্দোই এসে শেলভঙ্কারের মৃত্যুতে আক্ষেপের ভাণ করে আপনি পনেরোই বললেন বম্বে ফিরছেন। আসলে আপনি বম্বে যাননি, গ্যাংটকের আশেপাশেই কোথাও রয়ে গেছিলেন গা-ঢাকা দিয়ে। সেদিনই সন্ধ্যায় ডক্টর বৈদ্যর বেশে আপনিই আমাদের ভেলকি দেখালেন। আপনি জেনেছিলেন আমি ডিটেকটিভ–তাই আপনিই পেমিয়াংচি রওনা হবার আগে পাথর গড়িয়ে আমাকে সাবাড়ি করার চেষ্টা করেছিলেন; এবং আপনিই রুমটেকে আমাদের ফলো করে গিয়ে—'

ঘরের মধ্যে একজন বিকট হু হু হু শব্দ করে উঠল—কান্না আর ভয়ের মাঝামাঝি। ইনি নিশিকান্ত সরকার।

'বসুন নিশিকান্তবাবু।' ফেলুদা বলল, 'আর লুকিয়ে লাভ নেই। আপনি খুনের জায়গায় গিয়েছিলেন কেন? আর কাকে দেখেছিলেন সেখানে?'

নিশিকান্তবাবু হাত দুটোকে হ্যান্ডস আপের মতো করে মাথার উপর তুলে আবার সেই কোঁকানির সুরে বললেন, 'মশাই, জানতুম না। ওই মূর্তিটা এত ভ্যা-মানে ভালুয়েবল। তারপর যখন জানলুম—'

'টিবেটন ইনস্টিটিউটে আপনিই গেসলেন?'

'হ্যাঁ স্যার-আমিই। চাইতেই আন দি স্পট হাজার টাকা দিয়ে দিলেন। তাই সন্দেহ হল। তাই গোলাম-তা বলে কিনা ইউ–মানে ইউনিক জিনিস। তাই মানে-'

'ভাবলেন মরা লোকের পকেট মারতে ক্ষতি কী? বিশেষ করে এককালে সে জিনিসটা যখন আপনারই ছিল।'

'সেই-মানে, সেই আর কী।'

'কিন্তু আপনি সেদিন খুনের জায়গায় কাউকে দেখেননি?'

'না স্যার?'

'আপনি না দেখলেও, সে আপনাকে নিশ্চয়ই দেখেছিল- এবং ভেবেছিল আপনি তাকে দেখে ফেলেছেন। নইলে আর আপনাকে শাসবে কেন?'

'তা হবে!'

'মূর্তিটা কোথায়?'

'মূর্তি?' নিশিকান্তবাবু যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ফেলুদাও অবাক।

'সে কী!... আপনি তা হলে-'

হঠাৎ একটা হুড়মুড় শব্দ আর তার সঙ্গে একটা কেলেঙ্কারি। শশধরবাবু তার চেয়ার ছেড়ে উঠে একটা প্রচণ্ড লাফ দিয়ে দরজার মুখে দাঁড়ানো হেলমুটকে এক ধাক্কায় ধরাশায়ী করে বাংলো থেকে বেরিয়ে গেলেন। দরজা একটাই, আর তার সামনে হেলমুটের গড়িয়ে পড়া শরীর–তাই ফেলুদার বেরোতে দশ সেকেন্ডের মতো দেরি হয়ে গেল।

সবাই যখন বাইরে পৌঁছেছি তখন জিপের ইঞ্জিন গর্জন করে উঠেছে। এই ড্রাইভারটাকেও নিশ্চয়ই হাত করা ছিল, আর সে সেই ধরনের বিপদের জন্য তৈরিই ছিল। শশধর বাবুকে নিয়ে জিপ প্রচণ্ড বেগে ঢাল নেমে বনের দিকে এগিয়ে গেল।

এদিকে আমাদের জিপটাও গর্জিয়ে উঠেছে, কারণ থোণ্ডুপ বুঝেছে যে আমরা নিশ্চয়ই ফলো করব। কিন্তু তার আর দরকার হল না। গাড়ি অদৃশ্য হবার আগেই ফেলুদার রিভলভারের দুটো অব্যর্থ গুলি তার পিছনের দুটো টায়ারকে ফাঁসিয়ে দিল।

জিপটা রাস্তার একদিকে কেদ্‌রে গিয়ে একটা গাছের গায়ে ধাক্কা লেগে থেমে গেল। দেখলাম শশধর বাবু লাফিয়ে পড়ে উর্ধ্বশ্বাসে বনের দিকে ছুটলেন। ড্রাইভারটা উলটো দিক দিয়ে বেরিয়ে জিপের স্টার্টিং হ্যান্ডেলটা উঁচিয়ে এগিয়ে এল। ফেলুদা তাকে অগ্রাহ্য করে ছুটিল বনের দিকে-আমরা তিনজন তার পিছনে! ড্রাইভারকে নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও প্রয়োজন নেই, কারণ আমাদের থোণ্ডুপও তার জিপের হ্যান্ডেলটা হাতে নিয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে এগিয়ে চলেছে।

আমরা চারজন অন্ধকার বনের ভিতর ঢুকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে প্রায় দশ মিনিট খোঁজার পর হেলমুটের একটা হাঁক শুনে তার দিকে গিয়ে দেখি, শশধর বাবু একটা প্রকাণ্ড বুড়ো গাছের পাশে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত মুখ করে অদ্ভুত ভাবে লাফাচ্ছেন আর ছটফট করছেন।

আরও কাছে যেতে বুঝলাম যে তাঁকে জোঁকে ধরেছে-একটা নয়-অন্তত দুশো-তিনশো লকলকে জোঁক তাঁর দুই পায়ের হাঁটু অবধি, আর কাঁধে, ঘাড়ে আর কনুইয়ের কাছটায় কিলবিল করছে। হেলমুট বলল, ‘ভদ্রলোক বোধহয় এই আলগা শেকড়টায় হোঁচটি খেয়ে মাটিতে পড়েছিলেন, তাতেই এই দশা।’

ফেলুদা শশধরবাবুর কোটের কলার ধরে টেনে-হিঁচড়ে তাকে বনের বার করল। তারপর আমাকে বলল, ‘দৌড়ে গিয়ে জোঁক-ছাড়ানো কাঠিগুলো নিয়ে আয়।’

আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। আমরা ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে আছি। হেলমুট বাইরে দাঁড়িয়ে অকির্ডের ছবি তুলছে। থোণ্ডুপ গেজিং থেকে পুলিশ নিয়ে এসেছে। মূর্তিটা শশধর বাবুর কাছেই পাওয়া গেছে। খুনের সময় মূর্তিটা নেবার কথা তাঁর খেয়াল হয়নি। পরের

দিন সেটার কথা মনে পড়ায় লোভ সামলাতে না পেরে খুনের জায়গায় ফিরে গিয়ে সেটা একটা ঝোপের পাশ থেকে খুঁজে বার করেন। উনি যখন মূর্তি নিয়ে উঠে আসছেন, তখন নিশিকান্তবাবু একই উদ্দেশ্যে নামছেন। নিশিকান্ত শশধরকে দেখেনি, কিন্তু শশধর নিশিকান্তকে দেখেছে, আর সেই থেকে তাকে শাসাতে শুরু করেছে।

আরও একটা ব্যাপার–বম্বেতে নাকি শশধর বাবুর একটি সাকরেদ ছিল—তার সঙ্গে গ্যাংটক থেকে শশধরবাবুর টেলিফোনে যোগাযোগ ছিল। সেই সকরেদই নাকি ফেলুদার টেলিফোন ধরে, এবং ফেলুদার টেলিগ্রামের খবরটা সে-ই নাকি গ্যাংটকে শশধরবাবুকে জানায়।

ফেলুদা সঙ্গে পান এনেছিল; চিবোতে চিবোতে নিশিকাস্তুবাবুকে বলল, 'আপনিও যে একটি ছোটখাটো ক্রিমিনাল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নেহাত আপনার ভাগ্য ভাল তাই আপনি যমন্তকটা ফিরে পাননি। পেলে আপনার জন্যে একটা শাস্তির ব্যবস্থা করতে হত।'

নিশিকান্তবাবু কাঁচুমাচু ভাব করে বললেন, 'পানিশমেন্ট তো হয়েচেই স্যার! তিন-তিনখানা জোঁক বেরিয়েছে আমার ডান পায়ের মোজার ভিতর থেকে। অনেক রক্ত খেয়েছে ব্যাটারা। ফলে বেশ উইক বোধ করছি।'

'যাই হোক-ঠাকুরদাদার সংগ্রহ করা কোনও তিব্বতি জিনিস আশা করি ভবিষ্যতে বিক্রি করবেন না। এই নিন আপনার বোতাম।'

এই প্রথম লক্ষ করলাম ভদ্রলোকের শার্টের গলার সবচেয়ে নীচের ঝোতামটা নেই। নিশিকান্তবাবু বোতামটা ফেরত নিয়ে তাঁর চারকোনা গোঁফের নীচে সেই পুরনো হাসিটা হেসে বললেন, 'থ্যা-মানে থ্যাঙ্কস।'